New Zealand Sarbojonin Durgotsav 2023

Organised by

Probasee Bengalee Association of New Zealand

mai
TRIP
Love Your Holidays
Happy
Durgapuja
021 637 830
maitrip.co.nz

32nd Durgotsav 2023

Since 1992

Organised by Probasee Bengalee Association of NZ Inc.

PUJA NIRGHANTA 2023

Friday 20 Oct

8:00pm Agamani and cultural programme

Saturday 21 Oct

10:30am Mahashashthi Puja
12:30pm Arati
1:00pm Distribution of bhog and lunch
1:05pm Mahasaptami Puja
2:30pm Arati/Pushpanjali
7:30pm Sandhyarati followed by cultural programme

Sunday 22 Oct

10:30am Mahashtami Puja
12:30pm Arati/Pushpanjali
1pm Distribution of bhog and lunch
1:15pm Sandhi Puja
1:45pm Mahanavami Puja
3:00pm Arati/Pushpanjali
3:15pm Havan
7:30pm Sandhyarati followed by cultural programme

Monday 23 Oct

10:30am Dasami Puja
11:30am Sindur Daan

Note from the Editor

Svetlana Banerjee-Nandi

Our Probasee Durga Puja holds a very special place in all our hearts. For some of us, it gives us the feeling of having a home away from home. For some of us, it is the piece of us that connects us to our culture, and heritage. This weekend is the most awaited weekend and after a whole year of waiting, on the third day, we already start waiting for the next year – “asche bochor abar hobe”. The familiar sound of the dhak, ulu, and conch fill the air from the Friday night of Puja. Our Ma Durga murti stands with her beauty and strength leaving everyone in awe and admiration. She brings everyone together and brings hope to us all. The excitement and cheers of our reunited members fills all corners of the room. The delicious smell of pujo’r khichuri, luchi, and bhog make everyone hungry and the fights over narkoler naru and aloo bhaja begin. The numerous photographs and poses start as everyone comes decked up in brand new clothes.

This year we are celebrating 32 years of our Probasee Sorbojonin Puja here in Auckland. The theme for our decoration and some of the performances is a celebration of Satyajit Ray. We hope through this puja some people (like me) become more aware of some of our Bengali authors and filmmakers.

We are always very proud to present our Probasee souvenir magazine during Durga Puja. It is an opportunity for all our members to showcase their talents, passions, experiences, views, and knowledge. We have pieces written, drawn, and photographed by people throughout our community from all age groups. This year some of the topics that have been covered in the magazine are Nostalgia and memories, Durga Puja, Travels as people begin exploring the world again post COVID, other pieces covering various other topics, and a myriad of paintings, photography and sketches. We hope you take the time to read through, view, and enjoy all the submissions. A huge thank you to everyone who has sponsored or contributed to the magazine.

সম্পাদকীয়

স্বেতলানা ব্যানার্জী-নন্দী

আমাদের প্রবাসী দুর্গা পুজো সবার হৃদয়ে একটি বিশেষ স্থান জুড়ে আছে। ঘর থেকে দূরে থেকেও এই পুজো যেন অকল্যান্ডবাসী বাঙালীদের কাছে ঘরে ফেরার আশ্রয়। আবার কারোর কাছে এই পুজো আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে সংযোগ স্থাপনের এক মাধ্যম। এ এক মিলনযজ্ঞ, আমাদের রুটিন-বাঁধা দৈনন্দিন জীবনে নতুন আশার সঞ্চার। এই কটা দিন বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসবকে কেন্দ্র করে সবাই মিলে মেতে ওঠে আনন্দযজ্ঞে। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের চেনা ছন্দে ভরে ওঠে অকল্যান্ডের আকাশ-বাতাস। সবাইকে জানান দেয় মা দুর্গার আগমনের। আর আমাদের মা দুর্গার মূর্তি যেন তার সৌন্দর্য এবং শক্তির দ্যুতি দিয়ে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরিয়ে দেয় সকলের মন। আমাদের উৎসাহ আর বাঁধভাঙা আনন্দে চারিদিক গমগম করে এই তিন দিন। পুজোর খিচুড়ি, লুচি, এবং ভোগের মধুর সুগন্ধ; নারকেলের নাড়ু এবং আলু ভাজা নিয়ে কাড়াকাড়ি – এসবই পুজোকে এক অন্য মাত্রা দেয়। নতুন নতুন পোষাক পরে সবাই মিলে ছবি তোলার হিড়িক পড়ে যায় চারিদিকে। প্রবাসীর দুর্গাপুজো আমাদের সকলেরই নিজের বাড়ির পুজো। সার্বিক অর্থেই এই পুজো হয়ে ওঠে সর্বজনীন। পুজোর এই সপ্তাহের দিকে আমরা সারা বছর অধীর আগ্রহে চেয়ে বসে থাকি। অথচ এই এক বছর অপেক্ষার পর তিনটে দিন যে কোথা দিয়ে কেটে যায়, আমরা টেরও পাই না। আবার শুরু হয় আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা – "আসছে বছর আবার হবে"।

এই বছর আমরা আকল্যান্ডে আমাদের প্রবাসী সর্বজনীন দুর্গা পূজার ৩২ বছর পালন করতে চলেছি। আমাদের এবছরের মন্ডপসজ্জা এবং কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের থিম সত্যজিৎ রায়কে উদযাপন। আশা করি যে এই পুজোর মাধ্যমে আমার মতো আরো অনেক প্রবাসী বাঙালী, বিশেষ করে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম, আরো অনেক বাঙালী লেখক এবং চলচ্চিত্রকারদের সাথে বেশি করে পরিচিত হতে পারবে।

দুর্গা পুজো উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরেও রয়েছে প্রবাসীর তরফ থেকে এই পূজা সঙ্কলন। এটি আমাদের সদস্যদের কাছে তাদের দক্ষতা, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, এবং মতামত প্রদর্শনের সুযোগ। এর মধ্যে রয়েছে নবীন থেকে প্রবীন – সব বয়সের মানুষের লেখা, আঁকা, এবং ফোটগ্রাফি। দুর্গা পূজা, নস্টালজিয়া ও স্মৃতিচারণ, ভ্রমণকাহিনী, অন্যান্য বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে লেখা; এবং অসংখ্য চিত্রকলা, ছবি ও ফোটোগ্রাফিতে সমৃদ্ধ আমাদের এবারের ম্যাগাজিন। আমরা আশা করি আপনারা এগুলি উপভোগ করবেন। সর্বোপরি ম্যাগাজিনের সকল বিজ্ঞাপনদাতাদের এবং যেসব লেখক, লেখিকা, কবি, এবং শিল্পীরা এই ম্যাগাজিন সঙ্কলনে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

From the President’s Desk

Pavitra Kumar Roy
President
Probasee Bengalee Association of New Zealand

গগনচুম্বী স্কাই টাওয়ার হোক বা অধুনা সুসুপ্ত রাংগীটোটো আগ্নেয়গিরির পৃষ্ঠভূমি, গম্ভীর ও শান্ত সমুদ্র, নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকত হোক বা আঙুরের বাগান, এই শহর ঐতিহাসিক, প্রাগৈতিহাসিক , প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আধুনিকতার সমন্বয়ের এক অদ্ভূত নিদর্শন। আপনি প্রকৃতিপ্রেমি হোন বা ঐতিহাসিক, অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমী হোন বা খাদ্যপ্রেমিক, অকল্যান্ড অবশ্যই টানবে অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যা আপনাকে আরও বেশি কিছু পাওয়ার জন্য আকুল করতে বাধ্য।

সাদা মেঘের দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী, আমাদের প্রাণবন্ত এই শহর অকল্যান্ড-এর প্রবাসীর দুর্গাপুজোতে সবাইকে জানাই সুস্বাগতম। নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপে অবস্থিত, অকল্যান্ড এমন একটি শহর যা দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে তার শ্বাসরুদ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং মহাজাগতিক অনুভূতি দিয়ে। প্রবাসীর দুর্গাপুজোয় মূল আকর্ষণ অবশ্যই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তার বৈচিত্র্য, যার আয়োজন করা হয়েছে অক্টোবরের ২০ থেকে ২৪।

এ বছরের পুজোয় মন্ডপ সজ্জার থিম সত্যজিৎ রায়। ২০২৩ সালের ২০শে অক্টোবর, শুক্রবার সন্ধ্যার আকর্ষণ হলো আগমনি, অকালবোধন দুর্গাপুজোর ওপর এই নৃত্যনাট্য। শনিবারের একটি বৃত্তাংশে থাকছেন সত্যজিৎ রায় ও সঙ্গে লোকনৃত্য (1 ঘন্টার অনুষ্ঠান)। রবিবার সকালে আমরা আয়োজন করেছি শিশুদের "বসে আঁকো" প্রতিযোগিতার, থাকছে “ফ্যাশন প্যারেড”। সন্ধ্যায় বলিউড ডান্স আর ছায়া ছবির গান। দশমী পূজার পর সোমবার সকালে, প্রবাসী ও ভগিনী সংস্থাদের দ্বারা আয়োজিত হবে "ধুনুচি নাচ”, যা আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতির অভিন্ন এক অঙ্গ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বহন করার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রতিভা বা নৈপুন্যকে তুলে ধরার, সবাইকে আনন্দ দেওয়া ও নিজে উপভোগ করার এ এক অনন্য সুযোগ। যেদিকেই তাকান, দেখতে পাবেন ধুতি বা পাঞ্জাবী-পায়জামা পরিহিত মার্জিত পুরুষদের, আবার মহিলাদের সাজসজ্জাতেও ধরা পড়ে বৈচিত্র্য ও চমক, তা রকমারি গয়নাতেই হোক বা প্রাণবন্ত সব রঙের বাহারী শাড়িতে এবং অবশ্যই দৃষ্টিনন্দন ভাবে সুসজ্জিত হওয়ার মুনশিয়ানাতেও। প্রতিবছর প্রবাসে থেকেও আমাদের এই দুর্গাপূজা উত্তরোত্তর আরও বিবিধতা বা বৈচিত্র্য পেয়েছে। সাত সমুদ্র পারে সাদা মেঘের এই দেশে আমাদের ‘প্রবাসী’র এই দুর্গাপূজার একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার হলো পূর্ববর্তী প্রজন্ম, বর্তমান প্রজন্ম এ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে অসাধারণ সমন্বয়। এই সমন্বয় পুজো আয়োজনের প্রত্যেকটি পর্যায়তেই দেখা যায়। আমাদের দুর্গাপুজোর পৌরহিত্য গোড়া থেকেই নিয়মিত ভাবে করে আসছেন অকল্যান্ডের অধুনা সেবা নিবৃত্ত প্রফেসর দেবেশ বাবু। পুজো আয়োজনে, ভোগ রান্নায়, মন্ডপ সাজানোয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে অংশগ্রহন করেন সবাই ও আমাদের এই পুজোকে যথার্থই করে তোলেন সর্বজনীন।

আপনি কি প্রবাসীর 32nd দুর্গাপুজো উদযাপনে যোগ দিতে প্রস্তুত? তা হলে কোমর বেঁধে নেমে পড়ার প্রস্তুতি নিন একটি অসাধারণ জমজমাট পুজো উদযাপনের জন্য। বসন্তের হাওয়া শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আবেগ, উত্তেজনা এবং প্রত্যাশার অনুভূতিও এটি বহন করে।

CONTENTS

8
PUJA

8 Pujor Dingulo ar Haoay Ora Kichhu Kotha
Saswata Ray

10 Agomonir Gaan
Sunandini Mukherjee

10 Durgotsav
Sharmistha Roy

11 5 skills for mental wellbeing epitomised by Ma Durga
Sunaina Roy Vaz

12 Probasee Pujo: A Walk Down Memory Lane
Joyeeta Bhakta, Sujata Roy, Svetlana Banerjee-Nandi

16 Ballygunge to Probasee
Nishant Murali

17
NOSTALGIA

17 Memories of Dazzle
Karina Banerjee

18 Ami Chole Jabo Sekhane
Sarbari Kundu

19 Bekheyal
Bharat Manna

19 Memories of Bahrain
Swapan Banerjee

20 Aucklande 20 bochhor
Urmi Nandi

23
TRAVEL AROUND THE WORLD

23 Trip to Scotland
Atrayee Roy

26 Information about Pisa
Sudeshna Chatterjee

27 Dreams of Far-away Land
Sananda Chatterjee

27 The Great Barrier Reef
Prateeti Ganguly

28 Trip to Mexico
Nilabho Das

30
MISCELLANEOUS

30 Roktodaan
Prova Ghosh

30 Robi Bondona
Shikha Chatterjee

32 He Mohajeebon, He Mohamoron
Sanjay Banerjee

42 Joto Mot Toto Poth
Amit Sengupta

46 Stay Authentic
Shovik Nandi

49 Kolkata Special Chicken Cutlet
Raima Roy

50 Obosor Jeebon
Arabinda Ray

54 Tumi Chhara Shunyo Lage
Roopam Choudhury

59
ART/ PHOTOGRAPHY

Sujata Roy

Emili Biswas

Arpita Chanda

Shanta Basu

Srijan Bag

Anaya Sinha

Arpita Sanyal

Swayam Sarkar

Pankaj Bhakta

Udayan Basu

Ankita Gomasta Bose

EDITOR
Svetlana Banerjee-Nandi

COVER PAGE
Swayam Sarkar

PAGE LAYOUT
Soham Sakar
Siddhartha Roy

পুজোর দিনগুলো আর হাওয়ায় ওড়া কিছু কথা

শাশ্বত রায়

লেখা খুব অবাধ্য হতে পারে! এটা কখনো ভেবে দেখেছেন? অনেক সময় যে লিখছে তার ইচ্ছা; কম ইচ্ছা; ঠিক আছে থাক, অন্য কিছু লিখি, এই সবের মধ্যে ড্রিবল করে বেরিয়ে আসে মেসিলডো সম ট্যালেন্ট ভাঁজে! কখন যে সব পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসে, বুঝতেই দেয়না। ধরে নিন সেরকম একটা অবাধ্য লেখার খপ্পরে পড়ে এই লেখার আত্মপ্রকাশ।
মানে এই বলতে চাইছিলাম, পুজোর পাঁচটা দিনের যদি কোনো মনন, মানসিকতা, খেয়াল, ভাবনা, চিন্তা, ভালো লাগা, সারা বছরের জীবন যাপনের সাথে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায় তাহলে দিন গুলো কেমন হত?

আমরা কী বলতাম, আর দিন গুলোই বা কী বলত? কেমন লাগত তাদের দেখতে?

ষষ্ঠী: ষষ্ঠী বললেই মনে হয় এমন একটা দিন যে বলছে - হ্যাঁ, মানুষ তুমি এবার একটু বিরতি পেতে চলেছ। মানে আপনার ধরা যাক এক সপ্তাহে শুধু একদিন work from বাড়ী করার বরাত জোটে, তাহলে ঠিক তার আগের দিন office থেকে ফেরার পথে মনে যেমন একটা হালকা ফুরফুরে মেজাজ থাকে, ঠিক ওরকম। মানে জীবনে যে কোনো ভাবে এই রোজগেরে গতির মাঝে যে যতি আসবে, ষষ্ঠী তার একটা রোদেলা বা তোমার যদি ভালো লাগে তাহলে একটা মেঘলা পূর্বাভাস। ষষ্ঠী একটা হালকা করে গাড়ির সব passenger আগে থেকে বুঝতে পারবে এরকম একটা brake। ষষ্ঠী এমন একটা t-shirt যার বুকে পিঠে জবর হরফে লেখা আছে - "আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে"।

সপ্তমী: আজকাল আনন্দের আর নিরানন্দের দুটোরই মানে কিছুটা পাল্টেছে। আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার দাক্ষিণ্য আর সামাজিক বিবর্তন যেভাবে হতে থাকে; মানে কাটতে থাকা সময়ের সাথে, যেমন গান, আমি ভালো আছি কিনা, খুশি আছি কিনা তার সামাজিক স্বীকৃতি, তার যেমন মানে পাল্টায় সেরকম ভাবে, আমি ব্যাপক মজা করলাম, মানেই যে উদ্দাম কিছু করলাম - সেটা যারা আজকের যুগে এই সময়ে ভাবে না আমি জানিনা কেন সপ্তমীর মধ্যে তার একটা গাঢ় ছায়া দেখতে পাই। একটু চুপচাপ তবে ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত একটা দিন। একটু introvert প্রকৃতির তবে আলাপ হলে, তখন যে কখন মন থেকে খুব হেসে উঠবে, আর আপনি তা দেখে, গলে জল, বা জমে বরফ হয়ে যাবেন - সেরকম একটা দিন। সোফার দিন, চুপ করে বসে আছেন, ফেসবুক চর্চা নেই, বাজার করা নেই, যা যা করার দরকার করে ফেলেছেন, সেই দিনের জন্যে; আর যা বাকি ফেলে রেখেছেন, তা ফেলে রাখার স্বাধীনতা আপনার আছে সেরকম একটা দিন। সপ্তমী একটা খুব দরকারী প্রশ্রয়।

অষ্টমী: অষ্টমী হচ্ছে ফুল্লরা! জানিনা কেন এই শব্দটা মাথায় এলো! ঐ যে লেখার অবাধ্য চরিতের আর একটি আত্মপ্রকাশ। অষ্টমীর স্বভাব হচ্ছে, যারা বছরের বিশেষ দু এক দিনে বিশেষ দু একটি কাজ করেন তাদের দিন। অনেক মানুষের

মধ্যে দেখবেন লুকোনো কিছু চরিত্র থাকে। না না, দুমদাম এদিক ওদিক ভাববেন না, আমি বলছি ঐ ধরুন যারা শুধু পিকনিকে গেলে শুধু ক্রিকেট খেলে, ক্যারাওকে তে তার পছন্দের তিনটে গানের কোটার মধ্যে একটা পেলে মাইক এ অমাইক হয়ে ওঠেন, হটাৎ করে নিজের বিবিধ ভাবে পরিচিত প্রেমিকা, বা বউ অবাক হবেন সেই পর্যায়ে, একদিন হঠাৎ করে রোমান্টিক হয়ে ওঠেন, সেরকম একটা দিন। দিন আসলে, এক এক ধরনের না দেখতে পাওয়া মানুষ, যে তার সেই দিনের চরিত্র ময়ূরের পেখমের মত মেলে দিয়ে নাচে। আরে এসব পড়ে ঘাবড়াবেন না! জীবনটাই sci-fi, সব হয়!!

নবমী: নবমী দুঃখী বা দুঃখবিলাসী দুটোই, বা যারা এর মাঝামাঝি তেমন রঙের একটা দিন। এমনি ভালো লাগছে না; ভালোলাগার বেশ কিছু বা অনেকটাই কিছু হলো, ভালো লাগল, তারপরে আবার ভালো লাগছে না l ভালো লাগছে না - এটাই ভালো লাগছে বার বার। নুসরাত ফতেহ আলী খান, রফি, Lennon বা লালন চলছে, pause, আবার চলছে - আমি চলছি, বসছি, দিনটা, গান টা শেষ হয়ে যাচ্ছে - আমার কিছু করার নেই সেই জায়গা টা থেকে হয়তো খারাপ লাগাটা প্রতি নয় সেকেন্ডে জন্ম নিচ্ছে, নবমী এরকমই। ভালোলাগা গান শেষ হয়, খারাপ লাগে তবে আবার বাজিয়ে কোনো অকারণ কারণে শুনতে ইচ্ছে করেনা, সময় হয়না।

দশমী: আমার মতে দশমী চৈতন্যের প্রকাশ। এরকম বহু মানুষ আছেন যাদের বাঁচাটা অনেকটাই বোঝা হয়ে গেছে। বুঝে গেছে বিভিন্ন আলোর রং, পুণ্যের কারবার করার ইচ্ছেওয়ালা মনটাকে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব যে মনেরই সেটা বুঝে নেওয়া। "জীবে প্রেম করে যেই জন" - উর্ধ্বগামী, ব্যাপৃত মন - বুঝলেন নাকি? ঐরকম।
দশমী, যাওয়ার পরে আসা, আসার পরে যাওয়া - মাঝে কলহ থামিয়ে শান্তি, অনেক যুগ কাজের পরে বরাতের ক্লান্তি - দশমী কেমন যেন - আমি আবার ফিরে আসবো এর উদযাপন। সে ফিরে আসা, কিছু ক্লান্তির পর, সে ফিরে আসা দিলদার, তোমার কতটা সময় লাগবে সে নিয়ে ভাবেনা। সত্যি কারের জীবন অনুযায়ী বলা কথা - আবার ফিরে আসবো! তুমি না ফিরলেও, আমি না শুনলেও, এমন মনের কথা আর কাকে বলি বলো?

আগমনীর গান

সুনন্দিনী মুখার্জী

বর্ষাশেষে যখন নীল আকাশের গায়ে পেঁজা তুলোর মতন সাদা মেঘ ঘুরে বেড়ায়, শিউলিতলায় ঝরা শেফালি বিছিয়ে থাকে,বোঝা যায় শরৎ এসেছে, দিনের বেলায় উষ্ণ হলেও রাতের দিকে হিমেল ভাব থাকে বড় সুন্দর এই ঋতু, তার উল্লেখযোগ্য দিক হোলো এই সময়ই বাঙালির প্রিয় শারদোৎসব হয়। দুর্গা আসেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি, বাংলার গ্রামগুলোতে শোনা যায় আগমনী গান,বাঙালির কাছে দেবী যত না সিংহবাহিনী তার অধিক ঘরের কন্যা উমা।

এইখানেই বাঙালির বৈশিষ্ট্য সে 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়রে দেবতা'। তাই উতলা মেনকা গিরিরাজকে বলেন "যাও গিরিরাজ যাও,যাও আনিতে আমার সাধের উমারে,উমা চলে গেছে বহুদিন হল দেখিনি আমার পরাণপ্রতিমারে"।

এই দুর্গোৎসব যত না আচারনিষ্ঠ তার অধিক পারস্পরিক সম্প্রীতিতে,স্বদেশে, প্রবাসে সব বাঙালিই আনন্দপ্রবাহে ভেসে যায় এমনকি অন্য প্রদেশের মানুষরাও,পূজার দিনগুলো আনন্দমুখরিত হয়ে ওঠে, এই উপলক্ষে সবার দেখাসাক্ষাৎ হয়।

নবমীর রাত পোহালেই মা চলে যাবেন কৈলাসে,শিবের কাছে।
দর্পণে বিম্বিত মায়ের মুখ,
সবার চোখে অশ্রু,পান সিঁদুর দিয়ে মাকে বরণ করা হয়,অশ্রুসিক্ত নয়নে সবাই বলে 'পুনরাগমনায় চ'
আবার এসো মা।
বিসর্জনের পালা এবার,
শূন্য মণ্ডপে জ্বলে একটি প্রদীপ।

দুর্গোৎসব

শর্মিষ্ঠা রায়

পুজো আসছে, পুজো আসছে, আর কটা দিন বাকি

মনে বাজছে ঘন্টা কাঁসর, চল ঢাকিদের ডাকি।

শরৎকালের মিষ্টি রোদে, শিউলি ফুলের গন্ধে ভেসে,

দুলছে কাশের বন গুলো সব, পুজোর হাওয়ায় মেতে।

আয়রে সবাই, মাতরে সবাই, পুজোর সাজে সেজে।

নতুন জামা পরবে বলে, নতুন শাড়ি কিনবে বলে

দোকান গুলো উপচে পড়ে মা-মেয়েদের ভিড়ে।

পথে ঘাটে লোক ধরেনা।

ছোট্ট খোকার যত বায়না, মিটবে কি আজ,

ফুটবে কি আজ তাদের মুখে হাঁসি?

আয়রে সবাই, মাতরে সবাই, পুজোর সাজে সাজরে সবাই।

আমরা সবাই মিলে মিশে ঢাকের তালে নাচি।

5 skills for mental wellbeing epitomised by Ma Durga

Sunaina Roy Vaz

1. **Resilience** - the capacity to withstand, or to recover quickly from difficulties.

   The battle between Ma Durga and Mahishasura came to an end, after a grueling 10 days. Ma Durga teaches us that despite the myriad challenges presented to us, there is light at the end of the tunnel if we have the capacity to withstand and persevere. Durga Ma is resilient.

2. **Serenity** - the state or quality of being serene, calm, and tranquil.

   Ma Durga's image is one of calmness and tranquillity. She may be in battle, but her face and posture reflect peace, patience, and serenity. Durga Ma teaches us to find our calm amidst the storm. For some of us, calmness may be brought upon by simple acts of self-care, such as a refreshing cup of tea, a good book, a long nap, a good old yarn, exercise, or simply sitting in utmost silence. Finding what helps one feel calm, will help them through the storm.

3. **Compartmentalisation** - a mechanism allowing one to separate various aspects of one's life to prevent each from negatively impacting the other.

   Ma Durga skilfully compartmentalises with each of her 10 arms carrying different weapons, each serving an important purpose through the battle. She teaches us that although at times life may be overwhelming with expectations from 10 different directions, we can withstand by separating and compartmentalising.

   Pressures/stressors can be compartmentalised, not all of our problems need to be catastrophised as one massive, unresolvable problem, and not all of our issues need to be/can be resolved at once. Compartmentalising is an important life skill that helps to untangle, prioritise, and address factors one at a time to prevent overwhelm.

4. **Companionship/support network** - the people in your life that help, empower, and support you towards achieving your goals.

   Every year, Ma Durga arrives with her army of children who love, empower, and support her. She teaches us that life's challenges seem slightly more achievable with loved ones and a support network by our corner.

5. **Knowledge and wisdom** – accumulation of facts, information, skills, and experience - and having the direction and judgment of what to do with it.

   Ma Durga is also known as Trinayani Durga (the one with the third eye). The third eye symbolises wisdom and knowledge, as well as non-dualistic thinking. Durga Ma teaches us that we all possess a "third eye", which translates to not only knowledge and wisdom, but intuition, self-awareness, and self-enlightenment. This, however, may lie beneath layers of our consciousness. With intention and deliberate practice, our third eye can be awakened. Some ways may include spiritual practices, such as mindfulness, meditation, yoga, prayer, exercise, sleep, nutrition, acquiring knowledge through books and experiences, being mindful of what we consume physically, psychologically, and spiritually. Achieving a sense of balance in the four areas of "physical", "psychological", "social" and "spiritual" wellbeing, may also contribute towards the awakening of our third eye.

SUJATA ROY | SVETLANA BANERJEE-NANDI | JOYEETA BHAKTA

A Walk Down Memory Lane

Having attended our first Probasee Durga Puja celebrations many years ago (in Lana's and Suju's case, the late '90s!), we decided to revisit some of our favourite 'Pujo' memories and explore what the Probasee Durga Puja has meant to us. Together, we're excited to walk down memory lane, explore the spirit of the Probasee Durga Puja and recognise why it continues to be so special to us.

Early Pujo Memories

Many of us would have experienced Durga Puja in Auckland from our earliest days! What's your first memory of a Probasee Durga Puja?

Lana: Wow earliest memories... Our Probasee Durga Puja has been in my memories for as long as I can remember - for me, 'Pujo' *is* our Auckland Probasee Durga Puja. The dhak, the sound of mum singing '*sarva mangala*', the sit and draw competitions, and the night where everyone would start dancing like they had never danced before - those are my early memories of our Probasee Durga Puja. I remember my parents were very involved with Pujo, so I would always be with aunties, uncles, and didis. Everyone was like a big extended family.

Suju: My first recollection of the Probasee Durga Puja (or any Durga Puja for that matter!) is when I was told to recite a poem on stage. I just ended up hiding behind my mother, too shy to utter a word!

Joyeeta: Being called to the stage seems to be a common theme! Almost immediately after moving to Auckland with my family, I was given the role of "Papiya Pishi" (a bird) in a children's play for the 2003 Probasee Durga Puja and pulled into a rehearsal happening upstairs at Shovik's house in Lambie Drive. That would have also been the first time I met so many of the kids that now (20 years later!) have become such good friends. Truly a warm welcome!

Changes & Constants

In what ways do you think the Probasee Durga Puja has changed over the years? Which aspects do you think remain evergreen?

Lana: It has definitely gotten bigger with time - it is so nice to see so many people involved. I also think there is a lot more emphasis on the pandal and theme now - inspired by the incredible themes in Kolkata. With more photographers and phones, the "sari train pose" and mother-daughter photos have become a thing. I remember a long time ago, photos were the last thing on our minds but now they are definitely on the forefront. I do miss the mangsho on the last day which we enjoyed at the Onehunga hall - that place has so many memories. For things that never change - it would be the feeling: of family, togetherness, love, and celebration!

Suju: Over the years, we have held Pujo in a variety of locations, so I have specific memories associated with each place. Many old family friends have left, but at the same time many new faces appear. It's exciting seeing more young folk and my peers on the Executive Committee as well! What remains the same is the buzz and excitement of Pujo coming up. I specifically love that everyone gets involved in one way or another, whether it is preparing dances, preparing stage decorations, or the immense effort that goes into making all the delicious food, and then being at the pandal for the *anjali* and *aarati*.

Excitement & Anticipation of Pujo

What were some of your favourite parts about the Probasee Durga Puja growing up?

Joyeeta: I absolutely loved the lead-up to Pujo - learning what songs we were dancing to, our parents driving us across Auckland for weekly rehearsals, attending the first big "group" rehearsals (where we finally got to watch everyone's choreographies for the first time), trips to the dollar stores to pick up costume items, and the chaos that ensues when you're trying to teach kids how to dance in saris and dhootis. I treasure these memories - all of it was incredibly fun, and created an increasingly festive atmosphere. This meant that the excitement for Pujo started months before the actual Pujo weekend!

Lana: I couldn't agree more - when the rehearsals for *aagomoni* with Shantanu Maiti uncle would begin many years ago, that was the moment we would feel like yes, Pujo is coming. By being so involved in Pujo and the programmes, I feel that we developed a closer relationship with our Bengali culture. We are so far away from Kolkata, yet I feel like we are just as connected to Pujo. Every year, we were involved in the story of Durga Puja (*aagomoni*) and other dances in traditional clothes. I remember how tricky we found it to wear saris back then and look at us now. Once again, being all together for weekends in the lead up brought that sense of belonging and excitement. We would choose our clothes and plan out our evenings - it has definitely always been a much-awaited weekend.

Performances & Celebrations

Performances have been an integral part of the Probasee Durga Puja experience. All three of you have been involved in various dances and productions over the years. What are some of your favourite performances?

Joyeeta: There are so many performances that come to mind - my first being the 'Lion and the Rabbit' in 2003, the dance-drama production in 2010 (with the incredible songs from Bong Connection), Barso Re in 2007 and Nainowale in 2018... One of my stand-out favourites was the 'Festival of India' production from 2009. It was an exhilarating mix of variety, behind the scenes chaos, impromptu choreography and true celebration! Within our family friends, we always love rewatching videos from this particular production.

Svetlana: Ooh, I definitely loved 'Festivals of India just because we had so many people involved - the rehearsals were so much fun. Haha so many things went wrong too with dress changes and that makes it all the more memorable. Apart from that, I loved being involved in *Aagomoni* - something about those songs give the full Pujo feeling!

Sujata: It's definitely been a hot minute since I've performed on stage at Pujo, but for some reason I remember Ma teaching me and my friends the steps to 'Pagla Hawa'! I love watching all the beautiful performances on stage, especially if Ma is performing for *Aagomoni* on the first night. So much hard work goes into putting the shows together– and I love cheering on my friends, aunties and uncles, and young kids on stage!

Bishorjon Soundtrack

Speaking of dance, what is your favourite song (Bangla or non-Bangla) that gets you going on the Sunday night *Bishorjon* dance celebration?

Suju: 'Barandai Roddur'!!! 'Tomar Dekha Nai Re Tomar Dekha Nai...' and Mundiya Toh Bach Ke always gets people moving.

Lana: Completely agree!! We definitely always need a mix - one that gets us all going is 'Dhaker Tole'. Now there are so many new ones too!

Joyeeta: Those are absolute classics! I have to second 'Barandai Roddur' - Bhoomi is a staple on Sunday night. An honorary non-Bengali mention must be given to the 'Rang De Basanti' title soundtrack. That intro riff always brings a giant smile to people's faces on the dance floor!

The Spirit of Probasee Durga Puja

What do you think has kept you coming to Pujo every year?

Suju: So many things, but it's the excitement of seeing your friends and community for three-four days! Being able to dress up and see what your friends have worn! Taking lots of photos with all your friends and community. Eating delicious food while your khichidi mixes with your jalebi. Dancing with your friends at *Bishorjon*, *dhunuchi naach*, and hugging everyone saying… "aschey bochchor abar hobey! Hobei hobey!"

Lana: The people for sure - we are so lucky to have our extended Probasee family! Apart from that, it's Pujo!! How can we miss the excitement of meeting, dressing up, eating the Pujo food, listening to Debes Uncle, Mumma, and Rakhi Aunty, and dancing and watching the performances. It is definitely up there with my favourite weekends of the year!

Forming Your Own Traditions

Suju: It's interesting how traditions form. For me, it starts with listening to Birendra Krishna Bhadra's *Mahalaya* on the morning of *Mahalaya* because it has always been a tradition at home. There's something so comforting about listening to it in anticipation for Durga Puja and it just doesn't feel right if I miss it. I also love going shopping for Indian clothes at this time. Most of the time, my Thama and parents would give me money to buy a few new outfits… there's nothing that says Pujo like planning out what you'll wear each morning and evening!

When I was a child, it was all about getting ready for dancing, drawing competitions and planning sleepovers with my friends in Probasee. In my teenage years, even when I had exams coming up, I wouldn't miss the Probasee Durga Puja for the world. I would always have my textbooks in the car for comfort in the event I felt the need to revise. I just loved sitting next to my Thama and helping with making flower garlands or making sandalwood paste, and just feeling connected to Maa Durga.

When I moved out of home to Wellington, I realised my heart was in Auckland for the Probasee Durga Puja, and I always came home for it. I would describe it to my work colleagues as the "Christmas" for Bengalis, because it's all about being with the family and our Bengali community and a time to connect and reflect spiritually.

Kolkata-r Pujo

In what ways do you think Probasee Durga Puja celebrations capture aspects of the Pujo atmosphere in Kolkata?

Lana: I got the opportunity to see Durga Puja in Kolkata just last year. My heart and mind was definitely in Auckland during that time but witnessing and experiencing the traditional Durga Puja in Kolkata is something which will stay etched in my memories forever. It is unbelievable to see the thought and art that goes into the splendours at the pandals. I think our Probasee Durga Puja captures something that the smaller colonies in Durga Puja have (something I missed during pandal hopping) - a sense of belonging and family. Being connected to one Durga Puja is so special. The dressing up, dance, excitement in the lead up, and dhak at Probasee Durga Puja also very much mimics what happens in Kolkata.

Sharing the Spirit of Pujo

Over the years, you have invited friends from outside of Probasee to enjoy the spirit of Pujo with us. Tell us about some of their reflections of this celebration.

Suju: It's really special being able to share our celebrations with our friends outside the Bengali community, because it's hard to put into words how fun it is without experiencing it for yourself. I recently had a conversation where someone was brought to tears of joy from the feeling that came with visiting Probasee's Durga Puja as it reminded her of her time in Kolkata. It was so moving, and reminded me of how important it is to share our culture beyond our community, and it's a great opportunity to bring people along.

Joyeeta: I have loved bringing friends to Probasee Durga Puja, and sharing such a special part of my culture with them. I have often invited friends for the *Bishorjon* and *dhunuchi naach* celebration, and it has been so much fun seeing them enjoy the festivities, dance along to Bangla songs and immerse themselves in the excitement. We are so lucky to belong to such a vibrant and tightly-knit community, it is always such a thrill to share it with others!

Giving Back

What has it been like being involved with the Probasee Executive Committee (EC)?

Lana: It has been so nice! I have always been a part of Probasee and I feel like it has given us so much as a generation who was born and brought up in Auckland. I am so proud of how connected we all are to our culture because of the association.

It is nice to finally give back a little bit starting with a little role in the EC. It is fulfilling to see the process and all the things that happen behind the scenes to make everything happen. It would be so nice to see more youth get involved because we are the ones who will eventually take it further and we have benefitted so much from being a part of it.

The Essence of Pujo

In a few sentences, how would you describe the essence of the Probasee Durga Puja?

Lana: It is so hard to put Probasee Durga Puja in words - it's a feeling. A feeling of belonging, happiness, excitement, a bit of chaos (good chaos), and pride - pride in our culture and heritage.

Suju: I like how you've put it Lana, chaos in the best way possible. It's a festival celebrating Ma Durga's victory over Mahishasur, where the entire community comes alive in a vibrant celebration of traditions, laughter and togetherness. Even though we're so far from Bengal, we're all immersed in Bengali culture for the weekend!

Joyeeta: Celebration, community and the best kind of chaos! From the vibrant celebration of our culture and heritage, the sense of togetherness in prayer and gratitude, and the camaraderie with which the entire weekend comes together - Pujo weekend will always be a treasured part of every year!

It has been such a pleasure to reminisce over these memories that we've shared together, and explore how the Probasee Durga Puja has played such an important role in keeping us connected to our Bengali heritage. Thank you for sharing this journey with us. Shubho Bijoya!

BALLYGUNGE TO PROBASEE

Having been born in Chennai, but growing up in the heart of Kolkata (Ballygunge), Kolkata is home for me. Some of my fondest memories are of sitting in the truck to bring Durga Ma's murti to our building's Durga Pujo. The 5 days that followed were the most joyous 5 days of the calendar year. I have been very lucky to be adopted into Bengali communities, both back home and in New Zealand. I'm a Tamilian who barely speaks Bangla, yet my favourite memories of living in Kolkata have everything to do with Durga Pujo.

When I came to New Zealand in 2016, I really longed for Durga Pujo celebrations. From 2016 to 2022, I had not seen Durga Ma and I missed the festivities that came with her presence. During Pujo season, I would see the photos and video call my family back home, as they would enjoy the festivities in Kolkata. But it was not the same.

My first Probasee Durga Puja

Last year was my first Durga Pujo with Probasee. Having been introduced to the community initially through Rohan, one of the things that I am constantly grateful for is this amazing community that I get to call home away from home. It was great to be involved in the kitchen last year – it was great fun chopping potatoes and the banter in the kitchen was top notch.

When the Probasee Durga Pujo came along last year, I was excited to be part of Pujo festivities again. This time has always been about helping out and coming together as a community. From the day Pujo started to the day it ended, it felt like I had met a hundred new people, and I felt welcomed into a whole new family away from home.

Whether it is watching the dance performances, the singing, or just enjoying the camraderie in the kitchen – the Probasee Pujo is now an integral part of my year, and I have been looking forward to it ever since dashami last year.

To me, it makes perfect sense that we always say "asche bochor, aabar hobe!"

Dazzle, My First Friend

Karina Banerjee

Time has gone by so fast and it has been a year since you left us. I feel a tug in my heart whenever I see another dog walking by. We were both babies when we met and you were always there for us, everybody misses you.

Dad doesn't like to even think about getting another pet as he is still dealing with your loss, Dada keeps showing us reels about other dogs as he misses you a lot, Mum and I are always talking about old memories and looking at old pictures of you.

What we all miss the most is whenever we would come back home from work or school, you would be waiting at the door to greet us. The house feels so empty without you.

You had a special soul, and you were such a beautiful dog, I love how you were so protective of us and our house.

Dad tells stories about how when we were babies, you would always try to protect me from getting hurt, you were the cuddliest dog and always kept me warm.

Everyone thought you were a young dog even when you were older and everyone commented on your coat, you are still so beautiful in my mind.

Whenever we were in the car to take you to the vet somehow you always knew where we were taking you, so your muzzle would either look super happy or super worried.

You were always looking for food, especially chocolate or sweet stuff, you also loved to eat the feijoas in our garden. You never hated anything, you only disliked cats but I

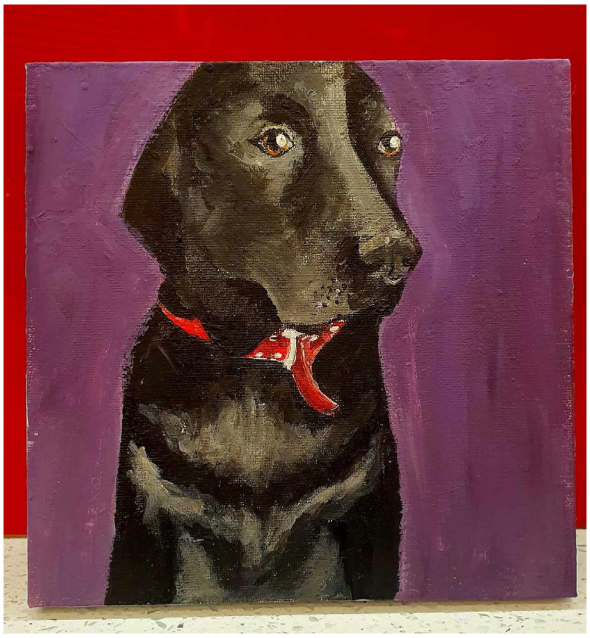

Painting by Anaya Sinha

know if you ever caught a cat you would let it go immediately.

You loved long walks and loved Cornwall Park. There are still times when I can hear your little paws tapping on the ground and I still feel you are with us, comforting and protecting us.

Sometimes I still see your fur around the house, and it makes me feel comfortable. Even though you were in so much pain you were still happy, and you still wagged your tail which proved how strong you were.

Thank you for being the bestest friend I could ever have. Some people were scared of you even though you were one of the sweetest and kindest souls.

I want to thank my dearest friend, Anaya Sinha, who gifted me a hand-painted picture of Dazzle for my birthday. It has a very special place in my heart.

আমি চলে যাবো সেখানে

শর্বরী কুন্ডু

আমি চলে যাবো সেখানে –
যেখানে শিশিরের ঝরে পড়ার শব্দে,
লজ্জা পাবে লাউডস্পীকারের চিৎকার।
যেখানে ফুল ফোটার শব্দে,
গাড়ীর হর্ণের কান ফাটানো আওয়াজ হবে ছত্রখান।
যেখানে তিতলিদের ওড়ার শব্দে,
মিছিলের শব্দময়তা করবে খানখান।

আমি চলে যাবো সেখানে –
যেখানে ম্যানহোলের ঢাকনা চুরির অপকর্মতায়,
মৃত্যু হবেনা একটি শৈশবের।
যেখানে স্বার্থান্বেষী মানুষের উন্মত্ততায়,
মিলিয়ে যাবেনা অর্ধশত তরতাজা তরুণের প্রাণ
জলঙ্গীর অতল জলে।

আমি চলে যাবো সেখানে –

FOR TOP RESULTS IN REAL ESTATE

Suresh RRK
Sales & Marketing Consultant

M 021 109 5336
suresh.rrk@harcourts.co.nz

Harcourts
www.harcourts.co.nz

বেখেয়াল

ড. ভারত মান্না

রোজগেরে জীবনের ব্যস্ততার জানালা দিয়ে
আজ চোখে পড়ল আকাশ পানে,
মনের মাঝে দম বন্ধ হয়ে আসা
বাচ্চাটা, তাকিয়ে রইল আনমনে।
বৃষ্টির গোমড়া মুখটা হারিয়ে গিয়ে -
নীল নীলিমায় সাদা মেঘের আনাগোনা;
অফিস-ট্রেন, আর ঘরের চার দেওয়ালে বন্দী পাখিটা
চাইল মুক্ত আকাশে মেলতে ডানা।
দু'চোখের স্বপ্নগুলো ওই ১০টা-৫টার ডিউটিতে
কবে হারিয়ে গেছে কেউ জানেনা,
ট্রেনের জানালার বাইরে সাদা কাশের বন
কই আর তো ডাকেনা!
তবু আজ অনেকদিন পর, যেন বাচ্চা ছেলেটা
অতীতের ক্যানভাসে আঁকলো, পুরানো স্মৃতিগুলো।
সেই স্কুলের পরীক্ষার শেষ আর -
পুজো-পুজো গন্ধে, "মা" এলো।
ভোরের আকাশবাণীতে যখন - "মাতলো রে ভুবন,
বাজলো তোমার আলোর বেণু –"
সবুজ ঘাসের ওপর তখন শিশির ভেজা
শিউলিফুলের মাতাল রেণু।
দূরদর্শনের পর্দায়, মহিষাসুরমর্দিনীর ডাকে
আজ আর ঘুম ভাঙে না,
নেই আর ছেলেবেলার মূর্তিগড়া
দেখতে যাওয়ার সেই উন্মাদনা।
ছোট্টবেলার একটা নতুন জামায়,
ছিল কতইনা সুখ।
এখন দশটা হয়, কিন্তু মনের ঘরে
যেন বিষাক্ত এক অসুখ।

আজ মনে হয়, ছেলেবেলার
ওই দিনগুলি ছিল ভালো,
পাওয়া-নাপাওয়া হিসেব বিহীন
অবুঝ শিশুটা ছিল ভালো।
বদলেছে দিন, অনিশ্চয়তা আজ
জীবনের প্রান্ত সীমায় দাঁড়িয়ে;
মোশানের এই ইঁদুরদৌড়ে
ছেলেবেলার ইমোশন গেছে হারিয়ে।
ট্রেন থামল পরের স্টেশনে, আরো একটা দিন
হারিয়ে গেল কিছু স্বপ্নপূরণের আশায়;
বাচ্চাটা মাথাচাড়া দিয়ে ঘুমিয়ে গেল,
শুধু জানলোনা, এই পথচলার শেষ কোথায়।

Memories

Swapan Banerjee

Memories are mixed with events and
surroundings

That happens day in and day out.

Little bits of moments of laughter written
on our minds.

The friendship and loved ones back
in Bahrain I remember

One could never forget.

Yes memories are happenings, each
one of a different kind.

Each one a new chapter

That is imprinted in our mind.

Since Memories are safe we make
new ones to store in our hearts...

অকল্যান্ডে ২০ টা বছর

উর্মি নন্দী

২১শে অক্টোবর ২০০২, দেশ ছাড়লাম। প্রিয় জনদের ওপরে রেখে পাড়ি দিলাম একটা অজানার খেয়ায়। নতুন একটা দেশে এসে পা দিলাম, কিছু জানিনা, কাউকে চিনিনা, ৩টে বড় বড় স্যুটকেস আর সাথে ক্যাবিন ব্যাগ নিয়ে এয়ার নিউজিল্যান্ডের ফ্লাইটে যখন উঠছি, তখন মেলানো মেশানো একটা অনুভূতি, প্রিয় জনদের ছেড়ে আসার কষ্ট, সাথে নতুন কিছুর আবেগ... সবাই বলল, "ও, তোরা বিদেশ যাচ্ছিস," একটা অনিশ্চয়তা মনটাকে ঘিরে রেখেছিল। কান্না পাচ্ছিল খুব, আবার নতুন আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম... আমরা ঠিক করেছিলাম দেখব কয়েকটা মাস, চাকরি-বাকরি পেলাম তো ভালো, না হলে তল্পিতল্পা গুটিয়ে আবার ফেরত যাব দেশে... এয়ারপোর্টে এসে ইনফরমেশন সেন্টারে গিয়ে মোটেল বুক করে যখন ট্যাক্সি উঠছি, একটা অদ্ভুত অনুভূতি সারা মনটাকে ঘিরে ধরল, "এ কোন বিদেশ?" এত ফাঁকা শুনশান, কত দূরে দূরে বাড়ি... স্যুটকেস গুলো চাপিয়ে খুব সাবধানে ট্যাক্সির ভেতর ঢুকে পুপুমকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকলাম... মিনিট দশের মধ্যে পৌঁছে গেলাম আমাদের নির্ধারিত মোটেলে। নতুন দেশ, তার নতুন নিয়ম, সব কিছু খুব নতুন ছিল বছর ২০ আগে...

সন্ধে হলেই মনটা কেঁদে উঠতো ফিরে যাবার জন্য। মিটমিট করে জ্বলছে স্ট্রীট লাইট, দোকান বাজার সব বন্ধ বিকেল ৫টায় - কি অদ্ভুত বিদেশ রে বাবা! মাঝে মাঝেই সোমুকে জিজ্ঞেস করি "কি গো ঠিক দেশ তো এটা?" এই সব অনিশ্চয়তার মধ্যে সোমু একটা কাজ পেয়ে গেলো। ব্যাস আর কি! রয়ে গেলাম অকল্যান্ডে।

আমাদের নতুন আস্তানা হলো ল্যাম্বি ড্রাইভে... শোভিক/পুপুম অ্যাডমিশন পেয়ে গেল বাড়ির কাছে Puhinui Primary School-এ। একদিন পুপুম স্কুল থেকে বাড়ি এসে বললো, "কাল 'bring a plate' আছে" । কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না! একদম অভ্যস্ত ছিলাম না এসবে ইন্ডিয়াতে থাকাকালীন, কখনো শুনিনি। একটা নতুন অভিজ্ঞতা হলো।

খবর নিয়ে জানলাম কাছেপিঠের ইন্ডিয়ান গ্রসারি শপ বলতে "Valley Fresh", Papatoetoe-তে। দোকানে গিয়ে নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছি, জিনিস খুঁজছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, "বাঙালী? আমি সুজয়, নতুন এসেছেন? পুজোতে দেখলাম না তো আপনাদের" - ওমা পুজো হয় এখানে? কোথায়?

ধীরে ধীরে আলাপ হচ্ছে বাঙালীদের সাথে। দিনগুলো যেন দৌড়াচ্ছে, শোভিকও কত বড় হয়ে যাচ্ছে...

আস্তে আস্তে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছি। মাঝে মাঝেই মজা লাগে, যখন ভাবি কলকাতায় থাকাকালিন কখনো নাটক করিনি, আর এখন এখানে গত কিছু বছর ধরে জমিয়ে নাটক করে বেরাচ্ছি। আজকাল তো আমরা পরিবারের সবাই নাটকে থাকছি।

এখন আমরা ৩জন থেকে ৪জন হয়েছি, ওহ থুরি, ৫ জন হয়েছি।

পোগবা কে তো চেনো সবাই, শেষ সাড়ে পাঁচ বছর ধরে আমাদের পরিবারের ছোট ছেলের স্থান নিয়েছে। যে উর্মির এত ভয় ছিল, তার সব থেকে কাছের বন্ধু হল পোগবা!

রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি।।

২০০৩ থেকে শুরু হলো পুজোয় যাওয়া। ব্যাস, আমাদের আর কে পায়! কলকাতার মতো অত জাঁকজমক নেই আমাদের পুজোতে - নতুন ঠাকুর নেই, প্যাণ্ডেল নেই। আছে শুধু একরাশ আনন্দ!

বাঙালীর পুজো মানেই দুর্গা পুজো! আমাদের পুজো হয় শুধু আড়াই দিনের জন্য। কলকাতার পুজোর দিন অনুযায়ী কাছাকাছি উইকেন্ড দেখে অকল্যান্ডের পুজোর দিন ঠিক করা হয়। বাক্সবন্দী ঠাকুরকে বের করা হয় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। আমরা সবাই পৌঁছে যাই ঠাকুরের আসন তৈরি করতে, ঠাকুরকে সাজাতে আর তার সাথে হল মানে যেখানে পুজো হচ্ছে, সেই ঘরটাকে সাজাতে। ঠাকুরের বোধন হয় শুক্রবার সন্ধ্যায় আর বিসর্জন রবিবার সন্ধ্যায়। এই আড়াই দিন শুধু চুটিয়ে আনন্দ, নতুন জামা কাপড়, গয়নাগাটি কেনাকাটি, সাজগোজ, খাওয়া-দাওয়া, আড্ডা, গান, নাচ, আর আজকালকার প্রধান আকর্ষণ লাইন ধরে ফটো তোলা। ফটো বুথও তৈরি হচ্ছে আবার আজকাল। এখন আমরা প্রতি বছর একটি থিম রাখি, সেই অনুযায়ী শান্তনু আমাদের ঠাকুরের আসন তৈরি করে। সকাল থেকে ভোগ বানানো, অঞ্জলি দেওয়া, আরতি, বাচ্চাদের নানা রকম প্রতিযোগিতা - এই ২টি দিনের সকাল কোথা দিয়ে কেটে যায়, টেরও পাই না। সারা দিন পুজোর পর সন্ধেবেলায় আরতি দিয়ে শুরু হয় সান্ধ্য অনুষ্ঠান। বসে যাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। হ্যাঁ মাঝেমধ্যে নিজেও অংশগ্রহণ করি।

দশমীর দিন মায়ের বিসর্জন, সিঁদুর খেলা আর ঢাকের সাথে শুরু হয় আমাদের উদ্দাম নাচ – বাচ্চা, বুড়ো, ছেলে, মেয়ে সবাই মিলে "ঢাকের তালে কোমর দুলিয়ে" মেতে ওঠে নাচে।

বিসর্জনের সাথে সাথে শুরু হয় ১ বছরের অপেক্ষা, "বলো বলো দুর্গা মাই কি, জয়!"

ঠাকুরকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় বাক্সের মধ্যে। "আসছে বছর আবার হবে!"

কলকাতার মতো বিজয়া করতে যাই না এখানে। আজকাল WhatsApp, Facebook এবং Messenger-এ চলে কোলাকুলি আর প্রণাম দেওয়া নেওয়া - "তোমরা আমাদের প্রণাম নিও, ছোটদের জন্য রইলো অফুরন্ত ভালোবাসা" মেসেজ যায় সকলের কাছে। আজকাল তো আরো সুবিধা - গ্রুপ মেসেজ পাঠিয়ে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি।

এখনো মনে পড়ে আম্মার হাতে তৈরি বিজয়ার মিষ্টি - লবঙ্গ লতিকা...

কী করে বানাতো আম্মা?

FOR THE FILLING
- 1 kg whole milk
- 45 g sugar
- ¾ tsp maida (flour)

FOR THE SUGAR SYRUP
- 400 g sugar
- 200 g water

FOR THE PASTRY
- 200 g maida (flour)
- 40 g ghee
- 4 g salt
- 80 g water
- ~ 400 g vegetable oil (for deep-frying)

Method

STEP I—PREPARE THE FILLING
- Take 1 kg milk in a heavy-bottom saucepan and set it to boil.
- Once bubbling, stir in 45 g sugar.
- Keep boiling the milk, while stirring it continuously, for about 90 minutes.
- During this entire time, the pot should be on medium to low heat.
- At regular intervals of 3–4 minutes, scrape the solids from the bottom and sides of the pot, and incorporate them into the boiling milk. This step, as well as the previous one, is crucial. We don't want our kheer to burn at any point.
- Once the milk has reduced and thickened (when you lift some of it on your spoon and drop it, it should fall in clumps), make a paste of ¾ tsp flour and 1 tbsp milk.
- Add this paste to the pot. Stir and cook for another 5 minutes.
- Divide the kheer into 10 portions of 20 g each.
- Cover and chill in the refrigerator for at least two hours

STEP II—THE PASTRY DOUGH
- In a mixing bowl, take 200 g flour, 40 g ghee, and 4 g salt. Mix these ingredients well till they take on a bread-crumb texture. The idea is to distribute the fat among the flour particles, in order to make the pastry crisp and flaky.
- Now, add in 80 g water.
- Mix until the dough comes together. This is a tight dough, so don't add more water even if it seems a bit dry at first.
- Cover the dough and rest it for at least 20 minutes.

STEP III—SHAPING

- Once the kheer has chilled in the fridge for at least 2 hours, and the pastry dough is rested for at least 20 minutes, proceed to shaping each of them.
- Shape each 20 g portion of kheer into 3 cm by 4 cm tablets. Put them back in the fridge to chill, till needed.
- Divide the dough in 10 portions of 30 g each.
- Shape each portion into a flat disc. Cover and rest, till needed.
- This proportion—20 g kheer and 30 g dough—will give you the best filling to pastry ratio.

STEP IV—CONSTRUCTION

- Roll each portion of the dough into a 14 cm disc, about 1 mm thick.
- Place a kheer tablet at the centre of the disc.
- With your fingertips, apply water to the edges of the rolled pastry. This will act as a glue.
- Fold the opposite ends over one another, overlapping them. Press gently to seal.
- Turn the pastry over and apply water to the protruding wings. Fold them over each other, sealing them as you go.
- Use a clove to seal the topmost layer of the envelope in place.
- Follow these steps for all the pastries.

STEP V—THE SUGAR SYRUP

- In a saucepan, add 400 g sugar and 200 g water.
- Cover with a lid and set it on medium heat for about 10 minutes, or till the sugar syrup starts bubbling.
- For this recipe, we do not want a thick syrup. It should be the consistency of, say, packaged fruit juice.

STEP VI—FRYING

- Heat oil in a frying pan to 150°C. The oil should be 5-cm deep.
- Lobongo lotika is not fried in hot oil like other deep-fried snacks or crisps. Since this pastry has a lot of layers of flour, we must fry it at low temperatures to ensure that all the layers cook through. If you try to fry it at a high temperature, the outside may look brown and done, but the inner layers will still be gummy.
- Because of the slow frying, each batch of lobongo lotika will take about 30 minutes to cook completely.
- During this period, turn them every five minutes to ensure that the dough is getting cooked, and hardening, from both sides evenly. Otherwise, the kheer may start to ooze out of the softer end.
- In case the filling leaks into the oil, you may remove the damaged pastry from the oil and put it inside an oven at 175°C for about 20 minutes.
- Once the pastries are golden-brown in colour, drain them from the oil and dunk them in the sugar syrup. Coat well, shake off the excess syrup, and place them on a plate to cool.

আমার আম্মা এখন আর নেই। কিন্তু আমার ওই লবঙ্গ লতিকা মুখে লেগে আছে এখনো!

কখনো কেউ চেষ্টা করলে আমাকে ডেকো please।

A Dream Come True: A Journey Through Scotland's Wonders

Atrayee Roy

For as long as I could remember, a desire to explore the diverse countries of Europe had simmered within me. It was a dream I harboured, one that beckoned with the promise of adventure and discovery. Little did I know that during a vacation in Bali, fate would gift me the opportunity of a lifetime – a chance to visit Scotland for a 7-night sojourn within the next two years. The universe had spoken, and my long-cherished wish appeared to be coming true. However, as fate would have it, the spectre of Covid-19 cast doubts over our travel plans. Yet, through unwavering persistence and determination, we found ourselves embarking on a journey to Scotland in the crisp March of 2023.

<u>Snowfall: A First Glimpse of Magic</u>

Our plane descended upon Edinburgh, the Scottish capital, on a leisurely Saturday afternoon. The city's aura was palpable, whispering tales of history and intrigue. We awaited a bus that would transport us to Sterling, the first stop on our Scottish odyssey. From Sterling, a cab ride led us to a destination of pure enchantment – the "Lake of Monteith." It was a structure that bore an uncanny resemblance to a castle from a bygone era. Our rooms were adorned with décor that transported us to the pages of history. But the true magic lay outside our window, where the lake stretched before us, transforming its countenance each day – one day adorned in snow, the next shrouded in rain, and occasionally basking in glorious sunshine. A peculiar fact was revealed to us – in Scotland, this is the only water body called a "lake," for the rest are lovingly referred to as "lochs."

A view from our window

A glimpse into Scottish history

As if by fate's decree, we encountered a friendly Yorkshire couple who graciously became our local guides. They led us on an extraordinary adventure, unravelling the rich tapestry of Scottish history. We set forth to explore Sterling Castle, a magnificent edifice housing the Grand Royal Palace. Its hallowed halls whispered of centuries gone by, echoing with stories of valour and tradition. Within its walls, we encountered the Great Hall, the Chapel Royal, and an enlightening castle exhibition. Our journey of discovery continued with a visit to the Regimental Museum and the Tapestry Studio, each unveiling a chapter of Scotland's illustrious past.

In front of Sterling Castle

The Wallace Monument: In the Shadow of a Hero

Our newfound friends regaled us with tales of valour and patriotism as we ventured further afield. We discovered the Wallace Monument, an iconic structure named in honour of Sir William Wallace, Scotland's national hero. Legends echoed within these hallowed grounds, recounting how Wallace led the Scottish army to a resounding victory at the Battle of Stirling Bridge. The Kelpies, majestic equine sculptures, and the enigmatic Falkirk Wheel were also on our itinerary, offering insights into Scotland's rich heritage.

The Kelpis

The Falkirk Wheel: A Marvel of Engineering Ingenuity

Yet, it was the Falkirk Wheel that left an indelible mark on our hearts. This awe-inspiring masterpiece of engineering excellence stood as a testament to human ingenuity. The Falkirk Wheel, born of the Millennium Link project, was a rotating boat lift nestled in the heart of central Scotland. Its purpose was to reconnect the Forth and Clyde Canal with the Union Canal, a feat not accomplished since the 1930s. In days of yore, waterways were the lifeblood of transportation, and the region's uneven terrain necessitated a unique canal system. Lock gates were strategically placed to facilitate the movement of boats. By elevating the water level, vessels could glide over these gates, enabling seamless transportation and fostering economic growth.

Sourced from Fairfields.co.uk

As we approached the Falkirk Wheel, we had no inkling of the spectacle that awaited us. Gazing ahead, we saw a large, covered boat serenely afloat in the water. Behind it, an imposing wheel with two gondolas stood as a silent colossus. Another boat lingered in the distance, seemingly awaiting its turn. Excitement pulsed through us as we secured tickets for a special boat ride. We were about to witness the Falkirk Wheel's marvel up close.

Our boat was gently latched onto a gondola and securely fastened. The colossal wheel began its slow, deliberate rotation, moving at a leisurely ⅛ of a revolution per minute. A complex system of gears controlled the speed and balance, and the transformation was so gradual that we barely felt the ascent. The panoramic view that unfolded before us was nothing short of breath-taking. The Falkirk Wheel harnessed Archimedes' principle of displacement, gracefully lifting our vessel as if guided by unseen hands. Two gondolas operated in tandem, raising and lowering boats by an astonishing 24 meters. As one boat ascended from the lower canal, another descended from the top canal, ensuring a delicate equilibrium. To access the Union Canal, boats also had to traverse two locks, adding to the sense of adventure. This experience was nothing short of unique, a once-in-a-lifetime spectacle that etched an enduring memory into my mind during our remarkable journey through Scotland.

Our new friends of Scotland!

A Journey to Remember

Our trip to Scotland was more than just a vacation; it was a journey of self-discovery, a voyage into the heart of history and innovation. It was a dream come true, a testament to the enduring spirit of exploration. Scotland, with its picturesque landscapes, storied past, and engineering marvels like the Falkirk Wheel, had welcomed us with open arms. As we departed, we carried with us not just memories but a profound appreciation for the wonders of this enchanting land. Scotland, you will forever remain etched in our hearts as a dream fulfilled, an adventure of a lifetime.

Some information on the Leaning Tower of Pisa

Sudeshna Chatterjee

There are numerous leaning towers in the world, 10 of them in Italy alone. Among them the Tower of Pisa, a jewel of Roman art, known all over the world for its four-degree lean and its architectural beauty, is one of the 7 wonders of the world. With its seven bells, it is a bell tower in the cathedral complex, the Duomo Square. Besides the Tower, this square also houses the Duomo (the Cathedral), the Baptistry and the Campo Santo (the monumental cemetery).

Its construction started in 1173. Unfortunately, the tower was built on a ground of soft alluvial soil, consisting of sand, clay and shells. Only after the first 3 layers were built, workers noticed that the base of the tower was sinking unevenly in the soil. Construction had to be halted to decide on ways to rectify this. The delay in construction was further stretched due to war between Pisa and Genoa. It was 100 years later that the construction was started again. Probably this gap helped the tower's foundation to settle down firmly and prevent an early collapse.

The construction was finally completed in 1370. However the weight of these additional constructions caused the tower to sink further and lean about 0.05 inches every year. In the year 1990, the tower reached a 5.5 inches lean (from its perpendicular original position) and had to undergo a lot of restoration work. Corrective action was taken to steady the soil underneath the foundation and correct the incline by 1.5 degrees. The tower is now declared safe, and experts feel that it can stand for another 200 years, barring any severe man-made or natural catastrophe.

It is to be noted, however, that the soft soil that led the tower to the verge of collapse, also helped it survive 4 severe earthquakes.

We visited the tower in April 2014 and here are a couple of photos from that trip.

Dreams of Far-away Land

সানন্দা চ্যাটার্জী

There will not be enough lifetimes
To satisfy my vagabond feet
To ground me to bricks nor mortar
To my knowledge, retract nor deplete
The sense of adventure that holds my heart.

What tales they tell
Grand palaces of gold
The little streams and their revolutionary road
Rising tides and waning family lines
An entire history of a people -
A people etched in stone.

Sometimes we wander an old town street
Unfolding lanes and cacophony unbound
Quietly hide to not step over the sound
Of the busker busking in the pale street light
Singing songs of love that go to sea.

Sometime the aunties selling you fans
Will croon you with a dance in hand
That was in the people's land
Where promises were free and unfulfilled
But once you start up the "Chan Chan",
Immerse in the Afro-Cuban spirit. Take flight.

Then linger with my love on the Seine
A favourite city to come back to and be
Bring home goods only in our mind's eye
The crowds, sweet smells of crepes and pee
Holding hands, getting lost. Refusing help
"let's just go this way and see".

I thought about the best way to tell
What I have gained, what I have earned
A regurgitation of facts wouldn't do
You can google that. I could google it too
Now when I want to travel without time
I find a frame, only I can find.
Zoom in, zone out and think about
A bustling world, amongst a dream.
Till I can add more to my till.
Don't wake me up, I'm mid air still.

The Great Barrier Reef

Prateeti Ganguly

We decided to go on a trip to Australia in the last term break. We flew to a little city called Cairns, the weather there was scalding! My dad had booked us a ferry to the Great Barrier Reef where we would be able to snorkel and see all of the beautiful marine life inhabiting it. I stepped onto the boat, unsure of what's to come. As we started getting closer and closer to our first stop, I started to feel a strange feeling in my gut, I was afraid. I changed into my wetsuit inside a small bathroom in the ferry, I put my flippers, snorkel and life jacket on, I was ready to go. There were so many thoughts going through my head, but I decided to just hop in. As I submerged my body in the water, I saw so many radiant colours all around me. I saw vibrant coral and dazzling fish, it was wonderful! The water was nowhere near as cold as I expected it to be, it was actually quite warm. Snorkelling in The Great Barrier Reef was definitely one of the most memorable experiences of my life, and that's saying a lot!

With Best Complements from Jayesh Bateriwala

Trip to Mexico

Nilabho Das

Mexico is known for its vibrant culture, breathtaking landscapes and its packed history. Our trip consisted 50% of uncovering their history and culture, taking in the beautiful views and the other 50% of looking for vegetarian food for my Dad in a place with meat in every meal. After battling heat stroke as the sun starts to boil you alive, Mexico's rich history can be appreciated with Mexico having three major ancient civilizations, the Aztecs and the Mayans and the Teotihuacan.

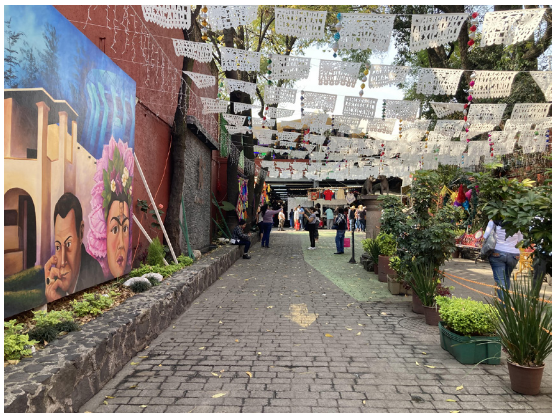

The Aztec Empire:
The history of the Aztecs starts with their migration to Mesoamerica in the **1200**s, the Aztec empire was a political alliance of around 50+ city states, each state having kings to interact with each other.
1521- Cortés mounted an offensive against Tenochtitlán, beginning on May 22nd with the help of native rivals of the Aztec. He defeated the then ruler of the Aztec Empire, Cuitláhuac, on August 13. The capital then fell into the hands of the Spanish marking the end of the Aztec Empire.
During the reign of the Aztec ruler Itzcóatl, an alliance was formed between Tenochtitlán (**1325**), the Templo Mayor, which was one of the principle temples of the empire.
Visiting Templo Mayor in modern times you can see just how much history was lost to time with them still uncovering the ruins of it till this day.

These spectacular, symbolic serpents lie within the shadow of the Great Temple.

The Mayans:
10,000 ~ 8,000 BCE- Mayans settled in what is now Mexico's Yucatan Peninsula with agriculture taking off in **6,000ish BCE** leading to massive population growth.

Golden age (150CE - 900CE- Coastal Maya decreased and lowland maya increased during this time. Many advancements were made during this time, mostly in astronomy; the famous Mayan calendar was developed then. After 900 CE there was a power shift again and
Chichen Itza (as my mum says chicken pizza) came to prominence during this era. Chichen Itza became the centre of mesoamerican trade. With the rise of chichen itza, Mayan society became more democratic.

Visiting locations of prominence for these ancient civilisations in modern times, in our case **Chichen itza** shows us how clever the people of these civilisations were without the use of modern technology. It has been concluded that the Mayans had a standardised unit of measurement as the dimensions of significant structures have shown to nearly always be multiples of 32.6cm, this measurement has been nicknamed the "Maya foot". The Mayans were also believed to have had significant knowledge about the earth rotating around the sun with the main pyramid at Chichen Itza, El Castillo, demonstrating the Mayan civilization's advanced understanding of astronomy and timekeeping.

During the spring and fall equinoxes, shadows cast on the pyramid's staircase create an illusion of a serpent descending, marking significant agricultural and seasonal changes for the Maya.

Teotihuacan:
Teotihuacan was an ancient mesoamerican civilisation established around 100 BCE. It is located northwest of Mexico city and links the Temple of Quetzalcoatl, the Pyramid of the Moon and the Pyramid of the Sun. Artefacts from the civilisation largely consist of pottery and bones. Out of the three civilisations covered this is by far the one the least known about in the modern day.

This trip has opened my eyes to what the people of ancient times managed to accomplish.

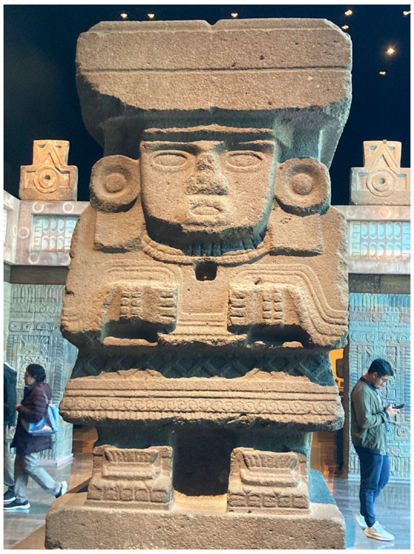

Mt Eden branch details

Phone: 09 6317844
Fax: 09 6317866
Email: mt_eden@midasnz.co.nz

For all your vehicle repairs,wof and servicing

MIDAS®
Mount Eden

09-631-7844
496b mount eden road, mount eden

MIDAS MT EDEN

Address:
496-504 Mt Eden Road
Auckland, 1024
New Zealand

রক্তদান

প্রভা ঘোষ

রক্তদান মহাদান
এজগতে যে জন তাহা করে
চিরদিন তার নাম
লেখা থাকবে রক্তের অক্ষরে।
রক্তের উৎপাদন দেহেতে
কোনদিন থেমে থাকে না
যাত দেবে, তত বেড়ে যাবে
কখনো দেহে তার অভাব হবে না।
দাও না দু'ফোঁটা রক্ত
থ্যালেসেমিয়া শিশুদের বেঁচে থাকার সুযোগ।
কত শত অবোধ শিশু তোমার আসা রক্তে
তাকিয়ে আছে সবল হৃদয় ভাণ্ডারের পানে।
তোমার রক্ত তোমার দান
এতো জীবের জীবন দান,
থাকবে বেঁচে চিরকাল
সকল প্রানের অন্তরে হয়ে মহীয়ান।
এসেছি দু'দিনের তরে
চলে যেতে হবে এ সংসার ফেলে
এ সত্য নড়চড় হবে না
শত চেষ্টা করলে।

রবি বন্দনা

শিখা চ্যাটার্জী

ভারত ভূমর হে সন্তান, বাংলা মায়ের কোলে,
জন্মেছিলে সরস্বতীর বর পুত্র হয়ে ।
শিব-সুন্দর, মদন-মোহন, কামদেব আর রতি
তোমার লেখায় ছড়িয়েছিল তাদের মহান দ্যুতি।
দুঃখে-সুখে, প্রেমে ব্যথায়, আনন্দে ও ছন্দে
সবার জীবন তুমি ভরিয়ে ছিলে
সাহিত্যের সকল চতুরঙ্গে।
সকল অনুভূতির মাঝে তোমার দেখা পাই
রবি, তোমার কিরণ দিয়ে
সাহিত্যকে করেছিলে রোশনাই।
বিশ্ব মাঝে "বিশ্বকবির" আসন রেখেছ পেতে
সাহিত্যে নোবেল পেয়ে তুমি আমাদের গর্বিত করেছিলে।
বৈশাখের প্রখর তেজে উঠেছিলে জেগে
শ্রাবণ ধারায় কাঁদিয়ে তুমি অস্তাচলে গেলে।
তোমার সুরের রেশ যে আজও
সবার বুকে বাজে
দুঃখে সুখে আনন্দেতে
সকল কাজের মাঝে।
তোমায় খুজি জীবন খাতার প্রতি পাতার মাঝে
তপ্ত দিনে, বর্ষা রাতে, স্নিগ্ধ সু-প্রভাতে।।

Dear community members our store which is ready to be served from always 9am to 6.30pm everyday.

Our address: 14 William Blofield Avenue, Mt Roskill, Auckland 1041

Imam Mortuza: 0211838411

A wide variety of frozen fresh water fish available, also available dry food items and dry fish at our store.

Please visit our facebook page and hit the like button to get updates. https://www.facebook.com/profile.php?id=100084930570678&mibextid=ZbWKwL

Thank you

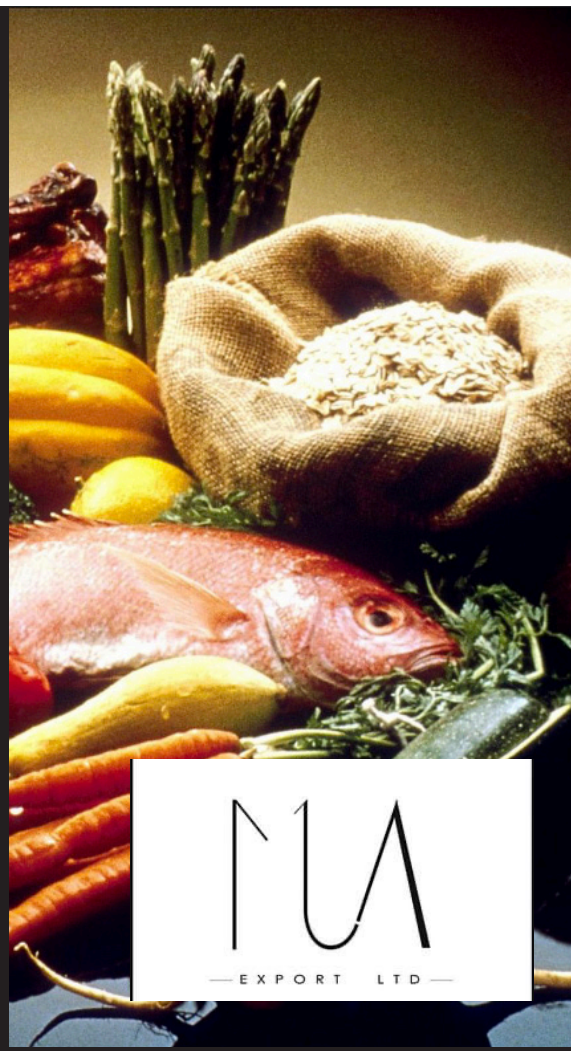

হে মহাজীবন, হে মহামরণ

সঞ্জয় ব্যানার্জী

" ....

১৯৪১ (১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)-এর ২২শে শ্রাবণ (৭ই আগস্ট)|

শুকনো মুখ, উস্কো চুল, চাপা ঠোঁট আর না-কামানো গাল - এতদিনের মধ্যে কখনো স্বাতী দ্যাখেনি সত্যেন রায়ের এ-রকম চেহারা। আর কথা যখন বললেন, আওয়াজটাও অন্যরকম শোনালো :

'শোনোনি এখনো?'

'কী?'

সত্যেন চোখ তুলল স্বাতীর মুখে, চোখ নামালো মেঝেতে, বললো, 'রবীন্দ্রনাথ -' আর বলতে পারলো না।

সঙ্গে সঙ্গে স্বাতীর মাথা নিচু হ'লো, আর হাত দুটি এক হ'লো বুকের কাছে। ....

দু-জনে দাঁড়িয়ে থাকল মুখোমুখি। কিন্তু মুখোমুখি না, কেননা দু-জনেই নিচু মাথা, আর দুজনেই চুপ। একটু পরে সত্যেন চোখ তুললো; স্বাতী তা দেখলো না, কিন্তু সেও চোখ তুললো তখনই : প্রশ্নহীন শান্ততায় তাদের চোখচোখি হ'লো।

......

সত্যেন রায়ের দাড়ি-গজানো শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বলল, 'কিন্তু আপনার স্নান-খাওয়া বোধহয় -'

'ও-সব এখন না,' ঈষৎ ভঙ্গি হ'লো সত্যেন রায়ের কাঁধে, ঈষৎ অসহিষ্ণুতার।

'আর দেরি না। চলো !'

'আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন। কিচ্ছু খাননি সকাল থেকে?'

'না, না!' একটু জোরেই ব'লে উঠলো সত্যেন। মনে-মনে একটু খারাপ লাগলো তার - যেন আঘাত লাগলো তার - আজকের দিনে, এ-রকম সময়ে এ-সব তুচ্ছ খাওয়া-টাওয়া নিয়ে স্বাতীর এই ব্যস্ততায়। সকালে প্রথম পেয়ালা চায়ের পরে এ-পর্যন্ত কিছুই খায়নি, তা সত্যি : কিন্তু এখন তার ক্ষুধাবোধ একটুও ছিল না, ক্লান্তিও না; আর কোনো চেতনাই তার ছিল না দুঃখের চেতনা ছাড়া; মহত, মহামূল্য, তুলনাহীন দুঃখ ; কল্পনায় চেনা, সম্ভাবনায় পুরোনো, তবু বাস্তবে আশ্চর্য, আকস্মিকের মতো নতুন, অবিশ্বাস্যের মতো অসহ্য। সকালে গিয়ে যেই বুঝলো যে আজই শেষ, তখনই স্থির করল শেষ পর্যন্ত থাকবে - তারপর কেমন ক'রে কাটল ঘন্টার পর ঘন্টা, ভিড় বাড়ল, জোড়াসাঁকোর বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা ভ'রে গেল, উঠোনে আরো -; টেলিফোনে ব'সে গেঞ্জি গায়ে কে-একজন ঘামতে-ঘামতে খবর জানাচ্ছে চেঁচিয়ে; তাছাড়া চুপ, অত লোকের মধ্যে কারো মুখেই কথা নেই, চেনাশোনারা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে কিছু বলছে না, নতুন যারা আসছে তারা কিছু জিজ্ঞেস না-ক'রেই বুঝে নিচ্ছে। অপেক্ষা, বোবা অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষা – কীসের? ... ... একবার, অনেকক্ষন পর, একটু বসেছিল সে, ব'সে থাকতে-থাকতে হটাৎ একটা শব্দ শুনল - পাশের ঘর থেকে - অনেকক্ষন চেপে রাখার পর বুকফাটা ঝাপ্টা দিয়েই থেমে যাবার মতো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই তাকালো হাতের, দেয়ালের ঘড়ির দিকে, বারোটা বেজে কত মিনিট কী -যেন ফিশফাশানি উঠলো। খানিক পরে যখন একবার ক'রে যাবার অনুমতি দিল সবাইকে - সেও গেল। মাথাটি মনে হ'লো আগের চেয়েও বড়ো, প্রকান্ড, কিন্তু শরীরটি একটু যেন ছোটো হ'য়ে গেছে, যদিও তেমনি চওড়া কব্জির হাড়, তেমনি জোরালো, প্রচন্ড আঙুল। শেষবার সে চোখ রাখলো তার কতকালের চেনা সেই মুখের, মাথার, কপালের দিকে, মহিমার দিকে; একবার হাত রাখল হিমঠান্ডা পায়ে। ... আর সেই মুহূর্তটি যেই মনে পড়ল সত্যেনের, যেই দেখতে পেল মনের চোখে আবার সেই প্রকান্ড মাথার ক্লান্ত নুয়ে পড়া, অমনি তার বুক ঠেলে একটা গরম শিরশিরানি উঠল, মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। মুহূর্তের চেষ্টায় আত্মস্থ হ'য়ে নিয়ে আবছা একটু হাসির ধরণে বলল, 'আচ্ছা, জল দাও এক গ্লাস।'

... "

ওপরের অংশটি বুদ্ধদেব বসুর তিথিডোর উপন্যাস থেকে উদ্ধৃত, ১৯৪১-এর ২২শে শ্রাবণ সত্যেন রায় আর স্বাতীর কথোপকথন। মহতী দুঃখ, অলৌকিক এক জীবনের মহাপ্রয়ানের দিনের পটভূমিতে উপরোক্ত আখ্যানের বর্ণনা| নশ্বর, মানবশরীরের মৃত্যুর অনিবার্যতাকে অতিক্রম করে অমৃত জীবনলোকের সত্যমূল্য প্রকাশ পাওয়া সেদিনের স্মৃতি আমাদের উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এক পবিত্র সম্পদ | কবির জীবনের শেষ বছরের বিষাদলিপির বিবরণ আমরা পাই তাঁর কাছের কিছু মানুষজনের স্মৃতিচারণা থেকে। আজকের এই অপটু, হেলাফেলা রচনার প্রচেষ্টা সেইসব কিছু জানা, অজানা নানা ঘটনার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে জ্যোতির্ময় পুরুষের উদ্দেশে প্রণামের অঞ্জলি প্রদান।

ছেলেবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী| তাঁর নিজের কথায় – "....শরীর এত বিশ্রী রকমের ভালো ছিল যে, ইস্কুল পালাবার ঝোঁক যখন হয়রান করে দিত তখনও শরীরে কোনোরকম জুলুমের জোরেও ব্যামো ঘটাতে পারতুম না। জুতো জলে ভিজিয়ে বেড়ালুম সারাদিন, সর্দি হল না। কার্তিক মাসে খোলা ছাদে শুয়েছি, চুল জামা গেছে ভিজে, গলার মধ্যে একটু খুসখুসানি কাশিরও সাড়া পাওয়া যায় নি। আর পেট-কামড়ানি বলে ভিতরে ভিতরে বদহজমের যে একটা তাগিদ পাওয়া যায় সেটা বুঝতে পাই নি পেটে,

কেবল দরকার মতো মুখে জানিয়েছি মায়ের কাছে। ..... জ্বরে ভোগা কাকে বলে মনে পড়ে না। ম্যালেরিয়া বলে শব্দটা শোনাই ছিল না। ওয়াক-ধরানো ওষুধের রাজা ছিল ঐ তেলটা, কিন্তু মনে পড়ে না কুইনীন। গায়ে ফোড়াকাটা ছুরির আঁচড় পড়ে নি কোনোদিন। হাম বা জলবসন্ত কাকে বলে আজ পর্যন্ত জানি নে। শরীরটা ছিল একগুঁয়ে রকমের ভালো।"

অনিন্দ্যসুন্দর রূপের অধিকারী, স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘদেহী (6'2") রবীন্দ্রনাথের শরীরে বড়সড় রোগের প্রথম লক্ষণ, কিডনির সমস্যা (ইউরেমিয়া) শুরু হয় ১৯৩৭ সালে | ১৯৪০ থেকে তা গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং জীবনের শেষ দু বছর এই সমস্যায় প্রচন্ড কষ্ট ভোগ করেছিলেন কবি | ডাক্তারদের নিষেধ না মেনেই ১৯৪০-এর শরতকালে কালিম্পং-এ যান কবি| তার আগে দীর্ঘ অসুস্থতায় কবির মনের জোর কিছুটা দমে গিয়েছিল ততদিনে| কবির স্নেহের বৌমা, প্রতিমা দেবীর স্মৃতিচারণে কবির কালিম্পং-এ এসে পৌছানোর সকালের দৃশ্য ধরা আছে এইভাবে, " .. উৎসুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় শুনি হর্ন বাজাতে-বাজাতে প্রকাণ্ড মোটরটা পাহাড়ের সরু রাস্তা বেয়ে নেমে আসছে। গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়ালো। আমরা এগিয়ে গেলুম, সুধাকান্ত[1] দেখলুম আগেই নেমে পড়েছে, তার পর বাবমশায়কে হাত ধ'রে নামিয়ে নিলে। এবার তাঁকে খুব অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হলো, চৌকিতে বসলেন, আমরা সকলেই খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইলুম। বাবমশায় নিস্তবদ্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, "বৌমা, মৈত্রেয়ী লিখেছিল ওর ওখানে যেতে কিন্তু সেখানে যেতে সাহস হলো না, আমি এখানেই এলুম। ডাক্তাররা বলছেন আমার কখন কী হয় তাই তোমাদের কাছাকাছি থাকাই ভালো। আমাকে এবার বড়ো ক্লান্ত করেছে, ভিতরে-ভিতরে দুর্বল বোধ করছি, মনে হচ্ছে যেন সামনে একটা বিপদ অপেক্ষা ক'রে আছে। "

জীবনের শেষ প্রহরেও তাঁর সৃজনীশক্তি ক্ষুন্ন হয়নি এতটুকু| কলিম্পংয়ে সপ্তাহখানেক অত্যন্ত ভালো ছিলেন কবি| দীর্ঘদিনের অবসন্নতা কেটে গিয়ে তাঁর মন আলো আর রঙের অনন্দধারায় স্নান করছিল নিয়ত| ২৫ শে সেপ্টেম্বর সকালে, খোলা দ্বার আর বাতায়ন দিয়ে উদার, ঋজু হিমালয় দেখতে দেখতে লিখলেন:

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

পরদিন, ২৬শে সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল শরীর ভালো না | স্থানীয় ডাক্তার গোপালবাবুকে ডাকা হ'ল - তিনি দেখে শুনে বলে গেলেন ভয়ের কিছু নেই, সামান্য হজমের গোলমাল সম্ভবত এবং সাধারণ ওষুধেই আরাম বোধ করবেন| সেদিন সকালেই মংপু থেকে এসে পৌঁছেছেন কবির পরম স্নেহভাজন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁর শিশুকন্যাকে নিয়ে | তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথ দারুন খুশী, সাময়িকভাবে তাঁর চেহারা থেকে অসুস্থতার চিহ্ন উধাও যেন | সদ্য শেষ করেছেন ল্যাবরেটরি গল্পটি, উৎসাহ ভরে নিয়ে এলেন পাণ্ডুলিপি প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবীকে শোনানোর জন্য | পরক্ষণেই বুঝতে পারলেন শারীরিক দুর্বলতা, পাণ্ডুলিপি মৈত্রেয়ী দেবীর হাতে দিয়ে বললেন "বড়োই ইচ্ছা ছিল গল্পটা তোমাদের প'ড়ে শোনাবো, বৌমাও শুনতে চেয়েছিলেন | কিন্তু সে আর আমার দ্বারা হল না, প'ড়ে নিও |"

দুপুরে অল্প খাওয়ার পর, গোপাল ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে খাটে গিয়ে শুলেন কবি | পাশের ঘরে বাকিরা খেতে বসেছেন, এমন সময় বালক সেবক কানাইয়ের চিৎকারে প্রতিমা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী ছুটে গেলেন গুরুদেবের ঘরে| দেখলেন তাঁর মুখ টকটকে লাল, চেতনা আচ্ছন্ন, পরম কাছের মানুষকেও তখন চিনতে পারছেন না অন্তর্দৃষ্টিসক্ষম মহাপুরুষ | আবার ছুটে এলেন গোপাল ডাক্তার, স্থানীয় হাসপাতালের ডাক্তারকে সঙ্গে করে | দুজনে ভাল করে পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন রোগ হজমের সমস্যার চেয়ে গুরুতর, গুরুদেব ইউরেমিয়ায় ভুগছেন এবং আশু অপারেশন ছাড়া পন্থা নেই | সে রাত কাটল গ্লুকোস আর ডাবের জল খেয়ে, কিন্তু পরের দিন সকাল থেকে আবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছেন গুরুদেব | শান্তিনিকেতন এবং কলকাতায় ট্রাঙ্ক কল করা হল | মৈত্রেয়ী দেবী দার্জিলিংয়ে যোগাযোগ করে সে রাতেই এক বড় সাহেব ডাক্তারকে আনার ব্যবস্থা করেছেন| সারা দিন কাটল গভীর আশঙ্কায়, কবি ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছেন, দুপুর থেকে গায়ে জ্বর ১০২| রাত আটটা নাগাদ এলেন সাহেব ডাক্তার – প্রথমেই প্রশ্ন, "ইনিই কি সেই ডক্টর টেগোর"? বুকে যন্ত্র লাগিয়ে পরীক্ষা করার জন্য পাঞ্জাবীর বোতাম খুলে দিলে, কবির চওড়া, বলিষ্ঠ দেহ দেখে আশ্চর্য হয়ে মন্তব্য করলেন, "What a body Dr Tagore has!"

পরীক্ষা শেষ করে সাহেব ডাক্তার জানালেন সেই রাতেই গুরুদেবের অপারেশন করা উচিত, নচেত প্রাণ সংশয় হতে পারে| গোপাল ডাক্তারও সহমত সাহেবের সাথে| প্রতীমা দেবী পড়লেন বিষম সঙ্কটে| রথীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য কাছের মানুষ, কলকাতার বিশিষ্ট ডাক্তারদের পরামর্শ বিনা, সুদূর নির্জন পাহাড়ে, অপারেশন-এর সঠিক সরঞ্জাম, বন্দোবস্ত ছাড়া অজানা, ডাক্তারের হাতে তুলে দেবেন এক মহাজীবনের বাঁচা মরার দায়িত্ব? আর যদি না বলেন, এবং তার ফলে কোনো নিদারুন পরিণতি ঘটে যায় সেই আশঙ্কাও ভয়াবহ| সহসা তাঁর মধ্যে এক গভীর বিশ্বাস, বোধ কাজ করল – "বাবামশায়ের ভবিতব্য কখনো এইভাবে শেষ হতে পারে না, তাঁর মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তি আছে তা এত সহজে নিঃশেষ হবার নয়|" তিনি দৃঢ় ভাবে সাহেবকে জানালেন যে আগামীকাল রথীন্দ্রনাথ এবং প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ কলকাতা থেকে ডাক্তার নিয়ে পৌঁছোবেন, তাঁদের আসা অবধি অপারেশন করা অপেক্ষা করতে হবে| সাহেব ডাক্তারের খুব ইচ্ছে যে সে রাতেই অপারেশন করেন – এত বিখ্যাত

[1] রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সচিব

রুগী তো সহজে পাবেন না, বিরক্ত হয়ে ভয় দেখালেন – "do you know Mrs Tagore, you are taking a huge risk for 12 hrs, you do not know what may happen tomorrow …" | ভয়াবহ আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল প্রতিমাদেবীর – কিন্তু শেষ পর্যন্ত অটল থাকলেন সিদ্ধান্তে, আর একদিন অপেক্ষা করতেই হবে কলকাতা থেকে প্রশান্তচন্দ্র ও রথীন্দ্রনাথের ডাক্তার নিয়ে আসা অবধি| দমে গিয়ে, ওষুধ দিয়ে বিদায় নিলেন সাহেব এবং বলে গেলেন দরকার হলেই তাঁকে ডাক পাঠালে তিনি সব কাজ ফেলে ছুটে আসবেন ডক্টর টেগোরকে দেখতে|

২৭-শে সেপ্টেম্বর সারা রাত কাটল নিদারুন আশঙ্কায়, প্রায় চেতনাহীন কবি, মাঝে মাঝে অসহ্য যন্ত্রনায় অস্ফুট শব্দ নির্গত হচ্ছে অচেতন মহামানবের মুখ থেকে। প্রতিমা দেবী স্মৃতিচারণ করছেন," ... সে যেন একটা ঝড়ের রাত। নিয়তির উপর নির্ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, ঝোড়ো সমুদ্রে যে জাহাজ ডুবুডুবু,তারই দিকে অসীম ভরসায় তাকিয়ে, মন তখন আতঙ্কে স্তব্ধ, কেবল ভরসা হচ্ছে বাবামশায়ের অপূর্ব জীবনীশক্তি তাঁকে এই দুর্যোগের রাত পার করিয়ে দেবে। ভোরের দিকে মৈত্রেয়ীতে আমাতে অস্ফুট আনন্দধ্বনি ক'রে উঠলুম, তাঁর চেতনা ফিরে এসেছে এবং অন্য সব লক্ষণ ভালো দেখা দিয়েছে। তিনি আমাদের চিনতে পারলেন .... কালরাত্রি শেষ হলো, আকাশে তখন আলো ফুটে উঠছে ধীরে-ধীরে।"

একটু বেলা হতে না হতে প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ, কবিকন্যা মীরাদেবী পৌঁছে গেছেন তখনকার বিখ্যাত তিন ডাক্তার ডাঃ জ্যোতিপ্রকাশ সরকার, ডাঃ অমিয়নাথ বসু এবং ডাঃ সত্যসখা মৈত্রকে নিয়ে| সাথে সাথে গ্লুকোস ইঞ্জেকশন দেওয়া হলো এবং কিছুক্ষণ পর ইঞ্জেকশনের ভালো প্রতিক্রিয়া দেখে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নিলেন সেদিনই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হবে| অ্যাম্বুলেন্স সাথেই এসেছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কবি রওনা দিলেন শিলিগুড়ি হয়ে রাতের বিশেষ ট্রেনে কলকাতার উদ্দেশ্যে| " .... তার পরদিন জোড়াসাঁকোতে পৌঁছে দোতলার পাথরের ঘরে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হলো। তখন তাঁর চেতনা অল্প ফিরে এসেছে, বললেন, 'এ কোথায় আমাকে আনলে বৌমা।' কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম। বললুম, 'এ যে আপনার পাথরের ঘর।' তিনি ব'লে উঠলেন, 'হ্যাঁ, পাথরই বটে, কী কঠিন বুক, একটুও গলে না।' আমি নীরবে তাকিয়ে রইলুম।"

জোড়াসাঁকোয় দু'মাসের ওপর প্রাণ সংশয় নিয়ে রোগের সাথে যুদ্ধ চলেছিল, অসহ্য কষ্ট পেয়েছিলেন কবি| আটজন ডাক্তারের এক কমিটি তৈরী করা হল এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিচর্যায় নভেম্বর থেকে রবীন্দ্রনাথের অবস্থার প্রভূত উন্নতি দেখা গেল| ডাক্তাররা বললেন বিপদ কেটে গেছে তখনকার মতো| কমিটিতে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আলোচনা হলো তখনই অপারেশন করা সঙ্গত হবে কি না। ডাক্তার নীলরতন সরকারের আপত্তিতে তখনকার মত স্থগিত রইল। তখনও কবি অসুস্থ, দুর্বল (আর কোনদিনই রোগীর অসহয়তা থেকে মুক্তি হবে না তাঁর)| এর মধ্যে এল ভাইফোঁটা| গুরুদেবের এক দিদি, বর্ণকুমারী দেবী তখনও জীবিত - তিনি এলেন আশি বছরের ভাইকে ফোঁটা দিতে। কবির তখনো উঠে বসার মতো অবস্থা নয়। দুজনে বর্ণকুমারী দেবীকে ধরে ধরে বিছানায় কবির পাশে জায়গা করে দিলেন। অশীতিপর বৃদ্ধা কম্পমান, শীর্ণ হাতে ফোঁটা এঁকে দিলেন ভগিনীর কাছে স্নেহের কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রশস্ত কপালে। ভাইয়ের বুকে, কপালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ভাইকে তীব্র শাসন করলেন, "দেখো রবি, তোমার এখন বয়েস হয়েছে, এক জায়গায় বসে থাকবে, অমন ছুটে ছুটে আর পাহাড়ে যাবে না কখনো – বুঝলে?" বিশ্ববিখ্যাত, জগতময় নন্দিত ভাই সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দিদিকে আশ্বাস দিলেন গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে, "না, কক্ষনো আর ছুটে ছুটে যাবো না; বসে বসে যাবো এবার থেকে"। উপস্থিত সকলের হাসি চাপা দায়।

তাঁর সৃজনশীলতা তখনও ঝর্ণার মতো নানা পথে প্রকাশ পাচ্ছে, নিজে লেখার ক্ষমতা না পেলেও মুখে মুখে ছড়া, কবিতা লেখা চলছে প্রতিদিন, সেই সময় আশেপাশে যাঁরা থাকতেন তাঁরা টুকে নিচ্ছেন সেসব রচনা| সেসময়ে লেখা বেশির ভাগ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল 'রোগশয্যায়' কাব্যগ্রন্থে| বইটি উৎসর্গ করেছিলেন রোগশয্যায় তাঁর দুই একনিষ্ঠ তরুণ সেবিকা শ্রীমতী নন্দিতা কৃপালিনী[2] ও শ্রীমতী অমিতা ঠাকুরকে[3]|

বিশ্বের আরোগ্যলক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যুপীড়িতেরে
অমৃতের সুধাস্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে,
রেখে গেনু তাদের উদ্দেশে
অপটু এ লেখনীর প্রথম শিথিল ছন্দমালা।

নভেম্বর-এ ডাক্তাররা মত দিলেন গুরুদেবকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাওয়ার| শান্তিনিকেতনের প্রিয় পরিবেশ, খোলা হাওয়া, শীতের নতুন আমেজে প্রথমেই কবির দেহ-মনকে সতেজ করে তুলল| সবার আশা হলো হয়ত কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগের মতো চলে-ফিরে বেড়াবেন তাঁর প্রিয় তপোবনে| সে আশা আর পূর্ণ হয়নি| শান্তিনিকেতনে ফিরে আসার পর থেকে দেহসংক্রান্ত ছোটোখাটো ব্যাপারেও অন্যের সেবায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন চিরদিন আত্মনির্ভর মানুষটি| নিজের গোপনীয় প্রয়োজনের ব্যাপারে সঙ্কোচময় মহাপুরুষকে অনেক ব্যাপারে ছোট শিশুর মতো লালন করতে হত| নিজেই রসিকতা করলেন, "আমি ছ-মাসের গ্লাক্সো বেবী হয়ে গেছি" | রোগযন্ত্রণার মধ্যেও হাসিতে, গল্পে, রসিকতায় আশে পাশের সকলকে সজীব রেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী পুরুষ।

অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজি - যে যেমন বলেন সবরকমই চিকিৎসা মেনে নেন গুরুদেব। মুখ বুঝে অসহ্য কষ্ট সহ্য করে চলেন

[2] মীরা দেবীর কন্যা
[3] নাতবৌ, কবির বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র অজীন্দ্রনাথের স্ত্রী

দিনের পর দিন, একমাত্র শেষ আশা অপারেশন| কিন্তু অপারেশনে তাঁর প্রবল আপত্তি| বলেন, "শনি যদি একটা কিছু ছিদ্র খোঁজে, সে যদি আমার মধ্যে রন্ধ্র পেয়েই থাকে - তাকে স্বীকার করে নাও। মিথ্যে তার সঙ্গে জুঝে লাভ কি? মানুষকে তো মরতে হবেই একদিন। এক ভাবে না এক ভাবে এই শরীরের শেষ তো হতে হবে, তা এমনই করেই হোক না শেষ। ক্ষতি কী তাতে? মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি, ছেঁড়াছিঁড়ি করার কী প্রয়োজন? তাঁর দেহ তাঁকে অক্ষতভাবেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া ভালো।"

দেখা যাক – আরও কয়েকদিন দেখা যাক এইভাবে কাটল| শরীরের নিদারুন কষ্ট সত্বেও সৃষ্টির অবসান নেই এই সময়ে| সকলবেলায় বারান্দায়, অপরাহ্নে ঘরের জানলার ধারে বসিয়ে দেওয়া হয়| ভোরের বেলা নাতনী নন্দিতা এসে হাত মুখ ধুইয়ে, চুল আঁচড়ে, চশমা পরিয়ে দেয়| সেইসময় একদিন সকৌতুকে নন্দিতার উদ্দেশে মুখে মুখে রচনা করলেন এই ছড়াটি:

ওরে মোর দোস্ত
আজকে সকালবেলা মেজাজটা খোশ তো,
একটু সময় নিয়ে কাছে তুই বোস তো,
কেন তুই চলে যাস, করি নাই দোষ তো।।

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১লা বৈশাখ শান্তিনিকেতনে পালন করা হল গুরুদেবের জন্মবার্ষিকী। রানী মহালনবিশের স্মৃতিকথা থেকে তাঁদেরকে পাঠানো ছাপানো নিমন্ত্রণপত্রের অন্য পিঠে রথীন্দ্রনাথের নিজের লেখা বার্তা থেকে অনুষ্ঠানের যথার্ত কারণ বোঝা যায়: "রানী-প্রশান্ত, শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আমরা জনমোৎসব যাতে অনুষ্ঠিত হয় তার চেষ্টা করছি। ভবিষ্যতে এইটাই স্মৃতিবার্ষিকী উৎসব হবে – মৃত্যু তারিখে করতে চাই না ..."

এই দিনে রবীন্দ্রনাথ মানুষকে উপহার দিলেন তাঁর অভিভাষণ, 'সভ্যতার সঙ্কট' | তাঁর হয়ে পাঠ করলেন ক্ষিতিমোহন সেন| তাঁর 'জন্মদিনে' বইটি বেরোলো, দেশবাসীকে সহস্তে এই তাঁর শেষ উপহার| নববর্ষের সার্বজনীন জন্মোৎসবের পর, 1941-এর কবির জীবদ্দশায় শেষ ২৫-শে বৈশাখও পালন করা হল অনাড়ম্বর ভাবে| তখন শান্তিনিকেতনে যথেষ্ট গরম| সন্ধেবেলা উদয়নের পুবদিকের আঙিনায় শামিয়ানা বেঁধে চাতলের ওপর ছাত্র-ছাত্রীরা অভিনয় করল 'বশীকরণ'| কবি একধারে আরামচৌকিতে ব'সে দেখলেন এবং উপভোগ করলেন | কবির প্রিয় সেবক, বনমালী সেদিন 'পুরাতন ভৃত্য' ভূমিকাতেই অভিনয় করেছিল এবং এতদিনের সেই আনন্দ-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তার প্রণাম প্রভুর পায়ে সেদিন পৌঁছে দিয়েছিল| অভিনয়ের পর সবার প্রশংসা শুনে বনমালী এক গাল হেসে বললেন, "বাবাঃ! আমি কক্ষনো কিছু করি নাই, তার উপর সামনে বাবামশাই চৌকিতে বসা। আমার তো কথা বলার সময় গলা বুজে যাবার মতো হচ্ছিল।" কবি সকলকে বললেন, "আমার লীলমণির [4] কত গুণ তাই দেখো। বাঁদরটা আমার কাছে থেকে নাটক করতেও শিখে গেল।"

[4] প্রিয় ভৃত্যকে দেওয়া কবির স্নেহের সম্ভাষণ

ক্রমেই কবির অবস্থা দিন দিন অবনতি ঘটছে| আঙুল আরও অসাড় হয়ে গেছে, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাকবি আর কলম ধরতে পারেন না| 1941, জুন মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতা থেকে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ইন্দুভূষণ বসু, ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী, ডাঃ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়| তাঁরা সবাই মিলে বোঝালেন গুরুদেবকে – এই অপারেশন এত সহজ, এতে ভয়ের কোনোই কারণ নেই,অপারেশন করলে ভালোই হবে এবং এ যন্ত্রণার থেকে রক্ষার এই একমাত্র পথ ইত্যাদি| গুরুদেব মুখে কিছু বললেন না আর সবাই মেনে নিল অপারেশন অনিবার্য|

1941 সাল, 25শে জুলাই কবির কলকাতা যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে| 24শে জুলাই থেকে কবি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন| বনমালীকে ডেকে বলছেন, জিনিসপত্র যা লাগে সব ঠিক করে নিস কিন্তু আমার যা যা লাগে। রথীন্দ্রনাথ আর অনিলবাবু একদিন আগে চলে যাচ্ছেন, কবি পৌঁছোবার আগে ব্যবস্থা করে রাখতে| অনিল চন্দ বিদায় জানাতে গিয়ে প্রণাম করে বললেন, গুরুদেব আপনার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি | রবীন্দ্রনাথ বললেন, গাড়ির ব্যবস্থা না মারবার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছ? অনিলবাবু ব্যথিত হয়ে, ছি, ছি এ কী অন্যায় কথা – এরকম কথা বলা আপনার মোটেই উচিত নয় .. ইত্যাদি বলে খুব আপত্তি জানালেন| এবার কবি হেসে বললেন, বাঙাল, ঠাট্টাও বোঝে না - না এমন ঠাট্টা করা আমার ভারী অন্যায়।

25শে জুলাই ভোর চারটায় কবির ঘরে গিয়ে রানী মহালনবিশ দেখলেন, তিনি তখনই পোশাক-আশাক পড়ে তৈরি হয়ে পুবের জানলার কাছে বসে আছেন | একটু পরে আশ্রমের ছেলে মেয়ের দল, এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার .., গাইতে গাইতে উদয়নের ফাটক পার হয়ে কবির জানলার নিচে এসে দাঁড়ালো| কবি জানলার ধারে ব'সে তাদের সঙ্গীতের অর্ঘ্য গ্রহণ করলেন| অসুস্থ হওয়ার পর থেকে ছেলেমেয়েদের কবির কাছে আসার নিষেধ ছিল তাঁর শরীরের ক্ষতি হবে বলে, এতদিনে তারা আবার সুযোগ পেল আচার্যকে গান শোনানোর| আজ ক্ষণিক পরেই তিনি বিদায় নেবেন, কেউ জানে না আর তিনি আশ্রমে ফিরবেন কী ফিরবেন না – বৈতালীকের গানের সুরে সেই অনুচ্চারণীয় ব্যাকুলতা ফুটে উঠল|

ক্রমে যাত্রার সময় এগিয়ে এল| কবিকে একটা স্ট্রেচারে শুইয়ে বাসে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, চোখে তাঁর কালো রোদ চশমা| সামনের গাড়িতে মীরাদেবী ও রানী মহালনবিশ| অসুস্থ প্রতিমা দেবী যেতে পারেননি, তিনি রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলেন আশ্রমের ছেলে মেয়েরা সমবেত কন্ঠে গাইছে, আমাদের শান্তিনিকেতন - আমাদের সব হতে আপন ... | মহর্ষি আচার্যকে তাঁর প্রিয় আশ্রমের উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের শেষ বিদায় প্রণতি|

ট্রেনে কবির জন্য একটা বিশেষ 'সেলুন কার' ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তাতে একটা বসবার এবং তার পাশে শোবার ঘর| প্রথমে কবি বসার ঘরে জানলার পাশে বসলেন তাঁর প্রিয় বাংলার দৃশ্যপট দেখতে দেখতে যাবেন বলে| অজয় নদী পার হবার সময় নন্দিতা দেবী বললেন, "দাদামশাই, অজয় পার হচ্ছো|" নিজের মনেই যেন

বললেন কবি, কতদিন পরে দেখলুম নদীটা। একটু পরেই ক্লান্ত বোধ করতে লাগলেন। সকলে ধরে এনে শোয়ালেন পাশের ঘরে বিছানায়। হাওড়া পৌঁছোনো অবধি পুরো পথ এলেন শুয়ে শুয়েই। গাড়িতে খাওয়ার জন্য চিঁড়ে-দই দিয়ে মণ্ড করে আনা হয়েছিল। মাঝে মাঝে তাই খাওয়ানো হয়েছে কবিকে।

বর্ধমান স্টেশনে নিবারণবাবু খবর নিতে এলেন, কেমন আছেন, কোনো কষ্ট হচ্ছে কিনা। গুরুদেব বললেন, না, বেশ আছি, দিব্যি 'মুন্ডু' খেতে খেতে চলেছি। নিবারণবাবুর অবাক দৃষ্টি দেখে মীরাদেবী হেসে বোঝালেন, মণ্ড খাওয়ানো হচ্ছে, বাবা তার নাম দিয়েছেন মুন্ডু। অসুস্থ, পথশ্রমে ক্লান্ত শরীরেও মনের সজীবতা দমাতে পারেনি।

কবির আগমনের কথা যথাসম্ভব গোপন রাখা হয়েছিল, হাওড়া স্টেশনে ভিড় ছিল না। একটা বড় বাসে করে স্ট্রেচার সমেত গুরুদেব এলেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে। যে স্ট্রেচারে এসেছেন, তাতে সেইভাবেই শুয়ে - ক্লান্তিতে খাটে ওঠানো গেল না। অপারেশান-এর জন্য ঘরদোর ঝকঝকে, কবিকে পাথরের ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ানো হলো। বিকেলে দু একজন কাছের মানুষ এসেছিলেন দেখা করতে, কারুর সাথে বিশেষ কথাবার্তা বলতে পারলেন না, ঝিমিয়ে রইলেন। সন্ধের দিকে খানিকটা ঘুমোলেন ঐ স্ট্রেচারে শুয়েই। সাড়ে সাতটা নাগাদ নিজের মনেই বলে উঠলেন, কী জানি, ভাল লাগছে না আমার। ঘরে উপস্থিত রানী চন্দ তা শুনে ব্যাকুল হলেও প্রকাশ করলেন না। তাঁর জন্য কেউ উতলা হয়ে পড়বে, গুরুদেবের কোনোদিন তা পছন্দ নয়। রানী চন্দ ঈশারায় এক সুযোগে ডেকে বললেন রথীন্দ্রনাথকে। রথীন্দ্রনাথ এমনিই আসার ভান করে ঘরে এলেন, সঙ্গে ডাঃ রাম অধিকারী। ডাক্তার গুরুদেবের নাড়ি দেখে, ওষুধ খাইয়ে বললেন ভয়ের কিছু নেই, পথশ্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছেন। রাতে ধরাধরি করে তুলে খাটে শোয়ানো হল। বেশ ভাল ঘুমলেন সে রাতে।

পরদিন 26শে জুলাই - গুরুদেবকে অনেক প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। রাতে ঘুম হয়ে ক্লান্তি অনেক কম, সকলের সাথে অল্প বিস্তর কথা বলছেন। অবনীন্দ্রনাথ গতকাল উঁকি মেরে ঐ অবস্থায় দেখে বারান্দায় এ-মাথা থেকে ও মাথা ঘুরে ছটফট করতে করতে ফিরে গিয়েছিলেন, আজ খুড়োকে ভাল দেখে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। রবীন্দ্রনাথের ঘরে গেলেন হাসতে হাসতে - ৮০ বছরের খুড়ো আর ৭০ বছরের ভাইপো অন্তরঙ্গ হয়ে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। 'ঘরোয়া' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে সদ্য লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, এমন আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। সবাই আমাকে ছিন্ন ভিন্ন করেছে, স্তুতি করতে গিয়ে আসল আমাকে ধরতে পারেনি। তোমার মুখ দিয়ে এতদিনে সবাই জানবে তোমার রবিকাকাকে।

বিকেল সাড়ে চারটেয় সত্যেন ডাক্তার গ্লুকোস ইঞ্জেকশন দিতে এলেন ডান হাতের শিরায় (intravenous)। ডাক্তার চলে গেলে রানী মহালনবিশ নুনের পুঁটুলি করে সেঁক দিচ্ছেন, কবি মজা করে রানী চন্দকে বলছেন – দ্বীতিয়া[5], গেল সব জ্বলিয়া। বলতে বলতেই সারা শরীরে লাগল কাঁপুনি। তিন চারজন কম্বল চাপা দিয়ে ধরে আছেন, ঠকঠক কাঁপছেন গুরুদেব। উপস্থিত ডাক্তাররা ব্যস্ত, বললেন গ্লুকোস ইঞ্জেকশন-এর কারণে কাঁপুনি। প্রায় 103 ডিগ্রী জ্বর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন আধঘন্টা পর, সারারাত কাটল আচ্ছন্নতায়।

27শে জুলাই। গুরুদেবের ঘুম ভাঙল, মুখ প্রসন্ন। রানী চন্দকে ডেকে মুখে মুখে একটা কবিতা বললেন। একটু পরে রানী মহালনবিশ এলে তাঁকে বললেন, জানো, আজও আর একটা কবিতা হয়েছে সকালে। এ কী পাগলামি বল তো? প্রত্যেকবারই ভাবি এই বুঝি শেষ, কিন্তু তারপরে দেখি আবার একটা বেরোয় – এ লোকটাকে নিয়ে কী করা যাবে। দৈববানীর মত সেদিনের কবিতাটি ছিল :

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে –
কে তুমি,
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় –
কে তুমি,
পেল না উত্তর।

কবির মেজাজ প্রফুল্ল, বললেন, ডাক্তাররা আমায় নিয়ে বেজায় বিপদে পড়েছে। হার্ট দেখে, লাংস দেখে কোথাও কোনো দোষ খুঁজে পাচ্ছে না। রুগী আছে, অথচ রোগ নেই, ওরা চিকিৎসা করবে কার - এতে ওদের মন খারাপ হবে না, বলো দেখি ? গতকালের কাঁপুনির রহস্য, অর্থাৎ গ্লুকোস ইঞ্জেকশন-এর প্রতিক্রিয়ার জন্য অমন কাঁপুনি বলা হয়নি কবিকে। লোকজন কমে গেলে, একান্তে রানী মহালনবিশকে বললেন… কাল ঐ খোঁচাটার জন্যই কাঁপুনি হল, কেমন? …. আঃ, ব্যাপারটা চুকে গেলে বাঁচি, তাহলে রোজ রোজ এই ক্ষুদে ক্ষুদে খোঁচাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।

গত একবছর অসুস্থ অবস্থায় বিছানায় আধশোয়া হয়ে ঘুমোতেন কবি। বিছানায় কোমর থেকে ঘাড় অবধি অনেকগুলো বালিশ জড়ো করে রাখা হত, হাঁটুর নীচেও সবসময় একটা মোটা বালিশ থাকত। অপারেশনের পর কয়েকদিন সোজা হয়ে শুয়ে থাকতে হবে, তাই ডাক্তাররা নির্দেশ দিলেন এখন থেকে এক-আধটা বালিশ কম করে অভ্যেস করানোর। রানী চন্দ বিকেলে পায়ের নীচের বালিশ ঠিক করতে গেলে তাঁকে বললেন, আর কেন? পা তুলে থাকা আমার আর চলবে না গো, উঁচু ঘাড়ও আর সাজবে না। যে ঘাড় কোনোদিন

[5] কবি কৌতুক করে রানী চন্দকে প্রথমা, রানী মহালনবিশকে দ্বীতিয়াবলে সম্বোধন করতেন মাঝে মাঝে

নামাই নি, আজ ডাক্তাররা বলছে, ঘাড় নামাও – কী অধঃপতন আমার হলো বল দেখি।

29শে জুলাই | কবিকে জানানো হয়নি পরেরদিন অপারেশনের দিন স্থির হয়ে গেছে| জ্যোতিডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, কী হে জ্যোতি, কবে দিন ঠিক হল? জ্যোতিডাক্তার প্রশ্নটা এড়িয়ে যান, এ'কথা সে'কথা বলেন, অপারেশনের সঠিক দিন জানান না পাছে গুরুদেব বিচলিত হয়ে পড়েন। কবি শুনেছেন তাঁকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করা হবে না, লোকাল এনেসথেটিক দিয়ে অপারেশন হবে| সংবেদনশীল কবির পক্ষে ঘটনাটি সুখকর ছিল বলে মনে হয় না এবং সজ্ঞানে তিনি যখন উপলব্ধি করবেন যে তাঁর অনাবৃত নিমাঙ্গে ডাক্তাররা অপারেশন করছেন, কারুর কারুর মতে সেই অভব্যতা কবিকে নিদারুন মর্মাহত করেছিল| এদিন বিকেলবেলাও কবি মুখে মুখে একটি কবিতা রচনা করলেন, রানী চন্দ লিখে নিলেন| তাঁকে পরে শোনানোর সময় রানী চন্দ বকুনি খেলেন, এখানটা কী হয়েছে, ছন্দ মিলল কোথায়? সংশোধন করলেন শুনে শুনেই| সেদিনের সেই কবিতাটির অংশবিশেষ এইরকম:

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত
অন্ধকার ছলনার ভূমিকা তাহার।
যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
ততবার হয়েছে অনর্থ পরাজয়। ....

30শে জুলাই | আজ সকালে অপারেশন হবে। পাথরের ঘরের লম্বা বারান্দার দিক ঘেঁষে অপারেশনের টেবিল সাজানো হলো। ঘরদোর ডিসইন্ফেক্ট্যান্ট দিয়ে মোছা হয়েছে, সাদা পর্দা দিয়ে আড়াল করা হয়েছে অপারেশন টেবিল, চারদিকের টেবিলে সার্জারীর যন্ত্রপাতি সাজানো হয়েছে ডাক্তারদের নির্দেশমত। সবকিছুই হচ্ছে গুরুদেবকে না জানিয়ে। আজও জিজ্ঞেস করলেন জ্যোতি ডাক্তারকে, আমাকে বলো তো, ব্যাপারটা কবে করছ তোমরা ? জ্যোতি ডাক্তার আমতা আমতা করে বললেন, এই তো, কাল কি পরশু - এখনো ঠিক হয়নি। রানী মহালনবিশ সমর্থন করেননি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই লুকোচুরি। তাঁর মতে, কি জানি এতটা লুকোবার কি দরকার ছিল?.... অনিশ্চিতের চেয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানলে - তা সে যত বড়ো বিপদই হোক, কবির মতো মন সহজে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে পারে।

কবি সকাল থেকে চুপ করে আছেন। এক সময় রানী চন্দকে ইশারায় ডেকে বললেন, লেখো। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, রানী চন্দ লিখে নিলেন ...

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তা'রে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভান্ডারে।

বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন কবি | অনেকক্ষণ বুকে দু হাত জড়ো করে চুপচাপ চোখ বুঝে রইলেন| সাড়ে ন'টা নাগাদ আবার রানী চন্দকে বললেন, লিখে নে শেষটা :

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

বেলা দশটার সময় আবার মুখে মুখে বলে রানীকে দিয়ে চিঠি লিখলেন স্নেহের পুত্রবধু প্রতিমা দেবীকে, যিনি অসুস্থতার জন্য শান্তিনিকেতন থেকে আসতে পারেননি | চিঠি শেষ হলে গুরুদেবের হাতে দেওয়া হল, বাড়ানো হলো কলম – কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠির নীচে সই করলেন, বাবামশায় |

সাড়ে দশটায় ডাঃ ললিতমোহন খুব সহজ ভাবে গুরুদেবের ঘরে এলেন, বাইরে আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে যেন ঝকঝকে দিন দেখে তখনই মনে এল বললেন, আজ দিনটা ভালো আছে, তা'লে আজই কাজটা সেরে ফেলা যাক – কী বলেন? গুরুদেব একটু হকচকিয়ে গেলেন, আজই? তারপর বাকিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ভালো, এরকম হঠাৎ হয়ে যাওয়াই ভালো |

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন | একবার শুধু রানী চন্দকে বললেন, আর একবার পড়ে শোনা তো কি লিখেছি আজ। রানী চন্দ পড়ে শোনালেন| বললেন, কিছু একটা গোলমাল আছে — থাক, ডাক্তাররা তো বলেছে অপারেশনের পর মাথা পরিষ্কার হয়ে যাবে, পরে দেখে ঠিক করে দেব।

এগারোটা কুড়িতে অপারেশন শুরু হল| অপারেশন করলেন ডাঃ ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁকে সাহায্য করলেন ডাঃ সত্যসখা মৈত্র এবং ডাঃ অমিয় সেন| কোনো নার্স রাখা হয়নি| একজন আন্যাসথেটিক প্রস্তুত ছিলেন ক্লোরোফর্ম গ্যাস নিয়ে, কিন্তু প্রয়োজন পড়েনি| সেলাই, ব্যান্ডেজ সব মিলিয়ে বড়জোর আধঘন্টার মধ্যে সব ভালো ভাবে শেষ হয়ে গুরুদেবকে আনা হল ঘরে| অপারেশনের পর ঘুমোলেন ঘন্টা দুই, তারপর চোখ মেলে চাইলেন – যথেষ্ঠ স্বাভাবিক মুখের ভাব, গ্লুকোস ইঞ্জেকশন দেওয়া হল|

বিকেলের দিকে বার কয়েক বললেন, জ্বালা করছে | গায়ে সামান্য জ্বর| সন্ধে সাতটার সময় ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন, অপারেশনের সময় আপনার কি লেগেছিল? গুরুদেব বললেন, কেন মিছে কথাটা বলবে আমাকে দিয়ে। তারপর বললেন, জ্যোতিকে একবার জিজ্ঞেস করতে চাই – সে যে আমাকে এত বোঝাল যে কিছু টেরটিও পাব না, তার মানে কী| এত কষ্টের মধ্যেও গুরুদেবের কথায় হাসি-ঠাট্টার সুর অমলিন — সবার মনে মেঘ কেটে গেল অনেকখানি| সেদিন রাতে ভালো ঘুম হল কবির |

১লা অগস্ট
দু-দিনের মধ্যে হাওয়া বদলে গেল। গুরুদেব অসাড় হয়ে, চোখ বুঝে শুয়ে আছেন। মাঝে মাঝে আঃ-উঃ, জ্বালা করছে ইত্যাদি যন্ত্রনাসূচক শব্দ বেরিয়ে আসছে প্রায় অচেতন দেহ থেকে। অল্প অল্প জল, ফলের রস খাওয়ানো হচ্ছে| ডাক্তাররা চিন্তিত, সারাদিন তাদের ফিসফিসানি, বন্ধ ঘরে আলোচনা চলছে| দুপুর থেকে হিক্কা শুরু হল, সবার মধ্যে ভয়ের ছাপ, ডাক্তাররা সঠিক কিছু ধরতে পারছেন না| সন্ধেবেলা রানী মহলানবিশকে দেখে বললেন, একটা কিছু করো। তুমি তো হেড-নার্স – দেখতে পাচ্ছো না কী রকম কষ্ট পাচ্ছি? কাছেই দাঁড়ানো সুধাকান্তবাবু সান্ত্বনা দিতে গেলেন, বললেন, এইতো এইমাত্র ইন্দুবাবু দেখে ওষুধ দিয়ে গেলেন, এটা খেলেই কমে যাবে। খুব বিরক্ত হয়ে গুরুদেব বললেন, কিচ্ছু কমবে না। ওরা যে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না আমি তা টের পেয়েছি, কেবল আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছে।

২রা অগস্ট
বেশির ভাগ সময় আচ্ছন্ন কাটালেন। সকালে খাওয়াতে গেলে বিরক্ত হলেন – আঃ, আমাকে আর জ্বালাস না তোরা। একজন ডাক্তার জানতে চাইলেন, কি রকম কষ্ট হচ্ছে আপনার। স্নিগ্ধ, ক্লান্ত হেসে বললেন কবি, এর কি কোনো বর্ণনা আছে? বিধানচন্দ্র রায় মাথা নীচু করে রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে মীরাদেবী, রানী মহলনবিশকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন, একটু থেমে বললেন, বাড়ির মেয়েরা তো কতরকম টোটকা ওষুধ জানে, তোমরা দাও না যদি কোনো টোটকা জানা থাকে হিক্কা থামাবার জন্য। সবাই নির্বাক - যখন ডাঃ বিধান রায় টোটকার ওপর ভরসা করতে চাইছেন তার অর্থ বুঝে নিতে অসুবিধা হলো না কারুর। দম আটকে আসতে লাগল সবার। ডুবন্ত মানুষের মত খড়-কুটো আঁকড়ে ধরতে চাইছেন সবাই। কবির স্নেহধন্যা, স্যার নীলরতন সরকারের ভাগ্নী, বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী, নিজেও উচ্চশিক্ষিতা ও বিদুষী রানী মহলনবিশ - কোথায় শুনেছিলেন ময়ূরের পালক পুড়িয়ে মধু দিয়ে সেই ছাই মেড়ে গুলি করে খাওয়ালে হিক্কা কমে। বীডন স্ট্রীটে ছুটলেন ময়ূরের পালক কিনতে। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ির ছাদে বসে ময়ূর পালক পুড়িয়ে ওষুধ তৈরি হল। বৃথাই সব আশা, প্রচেষ্টা - হিক্কা সমানে চলল, তার সাথে মাঝে মাঝে কাশির দমক। ক্রমশই নেতিয়ে পড়ছেন নশ্বর শরীরে জন্ম নেওয়া মহামানব। সারা রাত কাটল এইভাবেই।

৩রা অগস্ট
সকলেই বুঝছেন গুরুদেবের অবস্থা সঙ্কটজনক। ডাক্তারদের আশা পূর্ণ হয়নি। অপারেশনের পর কিডনী ঠিকমত কাজ করছে না, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত যে তীক্ষ্ণ মনন নিয়ে জন্মেছিলেন, সেই অলৌকিক চৈতন্য ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। শান্তিনিকেতনে ট্রাঙ্ক কল করা হল প্রতিমাদেবীকে তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য। প্রতিমদেবীও খুব অসুস্থ - কিন্তু ডাঃ শচীন সেন এবং কৃষ্ণ কৃপালিনী[6]-র সাথে সেদিন সন্ধেবেলার গাড়িতেই পৌঁছোলেন জোড়াসাঁকো।

সারা রাত কাটল পরম আশঙ্কায়। গুরুদেবের অচেতন শরীর থেকে মাঝে মাঝে কাতরানোর শব্দ সমবেত কান্নার মত জোড়াসাঁকোর বাড়ির দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল।

৪ঠা অগস্ট
ভোরবেলা সামান্য দু-একটা কথা বললেন। প্রতিমা দেবী কানের কাছে গিয়ে বললেন, আমি এসেছি, আপনার মামণি। তখন আগের মতো প্রসন্ন দৃষ্টিতে একবার তাকালেন আদরের বৌমার দিকে, আনন্দে ভরে উঠল প্রতিমা দেবীর বুক – পরমারাধ্য, পিতৃপ্রতিম মহাপুরুষ চিনতে পেরেছেন তাঁকে। প্রতিমা দেবীর হাতে একটু জল খেলেন – সেই শেষ জলদান প্রনম্য শ্বশুরকে|

৫ই অগস্ট
আজ আর কোনো সাড়াশব্দ নেই, সারা দিনই আচ্ছন্ন, অচেতন। বিকেলে স্যার নীলরতনকে নিয়ে বিধান রায় এলেন। কবির অর্ধনিমিলীত, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে পড়েছে পশ্চিমের আলো। স্যার নীলরতন চুপ করে বসে রইলেন কবির পাশে, কিছু করার নেই জেনেও অভ্যেসবশে নাড়ি দেখলেন, ঘড়ি বের করে শ্বাস-প্রশ্বাস শুনলেন – যতক্ষণ ছিলেন সস্নেহে গুরুদেবের ডান হাতের ওপর হাত বুলিয়ে গেলেন।

সবাই জানে অতি ভারী রোগের সামনেও স্যার নীলরতনের অবিচল, মৃদু প্রসন্ন মুখ দেখে কারুর বোঝার উপায় থাকে না অসুখ কত শক্ত। কিন্তু প্রবীণ, ধন্বন্তরী ডাক্তার আজ বন্ধুর রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেকে যেন সামলাতে পারছেন না, মুখে নিবিড় বেদনার ছবি পরিষ্কার। যাবার সময় স্যার নীলরতন রবীন্দ্রনাথের মাথার কাছ অবধি এসে একবার ঘুরে দাঁড়ালেন, আবার খানিকক্ষণ দেখলেন বহুদিনের সুহৃদকে, তারপর ঘুরে দরজা পেরিয়ে চলে গেলেন। সেই শেষ বিদায় সম্ভাষণের ভঙ্গিটি স্পষ্ট হয়ে গেল সকলের কাছে। আর আশা নেই।

৬ই অগস্ট
সকাল থেকে জোড়াসাঁকো লোকে লোকারণ্য। আজ পূর্নিমা, যদি কোনোরকমে আজকের দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যায় হয়ত ফাঁড়া কেটে যাবে। মীরাদেবী, রথীন্দ্রনাথের মত নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে রানী মহলানবিশ ছুটলেন কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কাতীর্থকে অনুনয় বিনয় করে একটিবার নিয়ে আসার জন্য। কবিরাজ রাজী হলেন, তবে তাঁর শর্ত অ্যালোপ্যাথির এম. বি ৬৯৩ ওষুধ বন্ধ করতে হবে, নাহলে কবিরাজি দাওয়াই কাজ করবে না, হিতে বিপরীত ঘটবে| রানী মহলনবিশ অবোধ শিশুর মত ছুটলেন বিধান রায়ের কাছে অনুমতি নিতে – যদি একটি দিনের জন্য বন্ধ করা যায় এম. বি ৬৯৩, যদি কোনো অলৌকিক উপায়ে পূর্নিমার রাত কাটিয়ে দেওয়া যায়| বিধান রায় ক্রুদ্ধ হলেন এমন অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনায়, মত দিলেন না। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন রানী মহলনবিশ, শেষ ভরসা হিসেবে কবিরাজকে আনতে পারলেন না। আর কিছু করার নেই, শুধু অপেক্ষা। শান্তিনিকেতনের চীনাভবনের অধ্যাপক কবির

[6] নন্দিতা দেবীর স্বামী, মীরা দেবীর নাতজামাই

পাশে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা প্রাচীন বৈদিক মতে জপমালা নিয়ে ইষ্টনাম জপ করে গেলেন।

৭ ই অগস্ট, ১৯৪১/ ২২-শে শ্রাবণ, ১৩৪৮
কবি পুবশিয়ারি হয়ে শোওয়া, ধীরে ধীরে পুবের আকাশ স্বচ্ছ হলো| অমিতা ঠাকুর খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ঠোঁটে একটু করে জল দিচ্ছেন, আর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কবির প্রদীনের ধ্যানের মন্ত্র, শান্তম শিবম অদ্বৈতম উচ্চারণ করছেন | বেলা সাতটার সময় রামানন্দ শাস্ত্রী পায়ের কাছে বসে পিতা নোহসি মন্ত্র পাঠ করলেন| বাইরের বারান্দায় মৃদু কণ্ঠে কে যেন গাইছেন, কে যায় অমৃতধাম যাত্রী ...| কবির পায়ে হাত রেখে নিঃশব্দে মনে মনে বলে চলেছেন প্রতিমা ঠাকুর, রানী মহালনবিশ – তমসো মা জ্যোতির্গময় / মৃত্যোর্মা অমৃতংগময় – অন্ধকার থেকে এতদিন যাঁর হাত ধরে আলোয় পার হতেন সকলে, তিনি চলে যাচ্ছেন অমৃতলোকের উদ্দেশ্যে|

সকাল ন'টায় অক্সিজেন দেওয়া শুরু হলো| ক্ষীণ নিশ্বাস ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হয়ে আসছে| দ্বিপ্রহর বেলা বারোটা দশ মিনিট শেষ নিশ্বাস পড়ল মৃত্যুহীন প্রাণের |

ঘর লোকে লোকারণ্য – আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, অজানা, অনাহূত ভিড় উপচে পড়ছে| একটু পরে সেবক-সেবিকা ছাড়া সকলকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা হল – গুরুদেবকে স্নান করিয়ে সাজানো হবে। যখন স্নান করানো হচ্ছে, একদল জনতা ওপরে এসে টান মেরে ছিটকিনি খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল। স্পর্শকাতর, অসীম অনুভূতিপ্রবন কবির কি নিদারুন অপমান – তাঁর প্রাণহীন, অসহায় দেহ একদল কৌতূহলী জনতার চোখের সামনে প্রদর্শনীর মত পড়ে রইল। তাড়াতাড়ি তাঁকে ঢাকা দিয়ে সকলকে কোনোমতে বের করা হল। এক এক দরজায় এক এক জন পাহারায় রইলেন – দরজায় ছিটকিনি সত্ত্বেও বাইরে থেকে প্রবল ধাক্কা। একটু আগের তীব্র শোকের অভিঘাতের চেয়ে সেই মুহূর্তে আতঙ্ক বড় হয়ে গেল সবার জন্য। গুরুদেবকে সাজানো হল বেনারসী জোড়ে| কোঁচানো শুভ্র ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, উত্তরীয়| ললাটে চন্দন, গলায় গোড়ের মালা, দু'পাশে রাশি রাশি রজনীগন্ধা, বুকের ওপর জোড় করা হাতে একটি পদ্মকোরক|

বাইরে তখন উন্মত্ত জনতার কলরব | জানলা দরজার ওপর ক্রমাগত প্রবল করাঘাত পড়ছে | রানী মহালনবিশের মনে পড়ল, কবি বহুবার তাঁদের কাছে ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন, তুমি যদি আমার সত্যি বন্ধু হও তাহলে দেখো যেন কলকাতার উন্মত্ত কোলাহলের মধ্যে, 'জয় বিশ্বকবি কি জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয় ' - এইসব জয়ধ্বনির মধ্যে যেন আমার সমাপ্তি না ঘটে। আমি যেতে চাই শান্তিনিকেতনের উদার মাঠ, উন্মুক্ত আকাশের তলায়, আমার ছেলেমেয়েদের মাঝখানে – সেখানে জয়ধ্বনি থাকবে না, অভব্য উন্মত্ততা থাকবে না, থাকবে শান্ত স্তব্ধ প্রকৃতির সমাবেশ। চিরকাল জপ করেছি 'শান্তম' - বিদায় নেবার সময় যেন সে শান্তম মন্ত্রই সার্থক হয়। তোমাকে বলে রাখলুম সব আগে থেকে। পীড়িতচিত্তে সেদিন এবং বাকি জীবন কবির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন তাঁর কাছের মানুষেরা, কবির শেষ ইচ্ছাপূরণ তাঁদের সাধ্যের বাইরে ছিল ভক্ত জনতার নারকীয় উল্লাসে|

বেলা তিনটে বাজতে এক বিরাট জনতার ঢল ঘরে ঢুকে কবিকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল| জনসমুদ্রের ওপর দিয়ে যেন একখানা ফুলের নৌকা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেল| নিমতলা শ্মশানের পথ লোকে লোকারণ্য, বন্যা স্রোতের মত সবাই ছুটছে কোনভাবে একবার শবদেহের কাছে যাওয়ার জন্য| সমস্ত আকাশ সেদিন কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিল শ্রাবণের ধারায়। সেই অশ্রুতে ভিজেছিল অগণিত মানুষ | মানুষের ভিড় ঠেলে শবদেহ নিয়ে শ্মশানে ঢোকাই অসম্ভব| উন্মাদ মানুষের হাত থেকে কবির প্রাণহীন দেহ রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়ছিল| খবর গেল লালবাজারে – গোরা সার্জেন্ট এসে লাঠিপেটা করে জনতাকে কিছুটা আয়ত্তে আনলো, শবদেহ নিয়ে আসা হলো দাহ করার জায়গায়| মুখাগ্নি করার জন্য রথীন্দ্রনাথ যেতে চান, কিন্তু সাধ্য কী তাঁর সেই ভয়ঙ্কর ভিড় ঠেলে শবদেহের কাছে পৌছান! পুলিশের চোঙায় বারবার অনুরোধ করা হলো, উনি রবীন্দ্রনাথের পুত্র, ওনাকে পথ ছেড়ে দিন নাহলে ছিটে আগুন দিতে বিলম্ব হবে। কে কার কথা শোনে। প্রবল জনসমুদ্রের গর্জনে কোথায় মিলিয়ে গেছে সে অনুরোধ – প্রণাম, ভক্তি জানানোর এক বীভৎস প্রক্রিয়ায় মেতে উঠেছিল সেদিন কলকাতা| রথীন্দ্রনাথের শ্মশানে ঢোকা তো হলই না, অসুস্থ বোধ করলেও বাড়ি ফেরাও তখন দুষ্কর|

ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথের পুত্র, কবির দৌহিত্র সুবীর কোনোমতে নিমতলার পাশের সীমানা দিয়ে গঙ্গায় নেমে, তারপর অন্যদিকের পাঁচিল পেরিয়ে শ্মশানে টপকে ঢুকে দাদামশায়ের মুখাগ্নি করলেন। প্রবল বৃষ্টিতে চিতা সাজানো তখন দুস্কর। জনতা তখন উন্মাদপ্রায় – শবদেহ ছোঁওয়ার জন্য, চিতাভস্ম নেওয়ার জন্য (দাহের আগেই), এমনকি মহাত্মার শরীরের অংশ – চুল, দাড়ি, নখ সংগ্রহ করার জন্য জনতার হাত থেকে কোনোমতে দেহ রক্ষা করছেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী ইত্যাদিরা। শেষ অবধি চিতায় আগুন জ্বলল, ভস্ম হল মহামানবের নশ্বর দেহ। জয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জয় প্রবল ধ্বনি ছাপিয়ে হয়ত তখন দেবালোকে উচ্চারিত হচ্ছিল –

কে যায় অমৃতধামযাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে॥
আনন্দরব শ্রবণে লাগে, সুপ্ত হৃদয় চমকি জাগে,
চাহি দেখে পথপানে॥

মূল তথ্যসূত্র :

1. গুরুদেব : রানী চন্দ
2. নির্বাণ : প্রতিমা দেবী
3. ২২শে শ্রাবণ : নির্মল কুমারী মহালনবিশ
4. ২২শে শ্রাবণ : সুধাকান্ত রায়চৌধুরী

Some Glimpses of Probasee Bengalee Association's Events

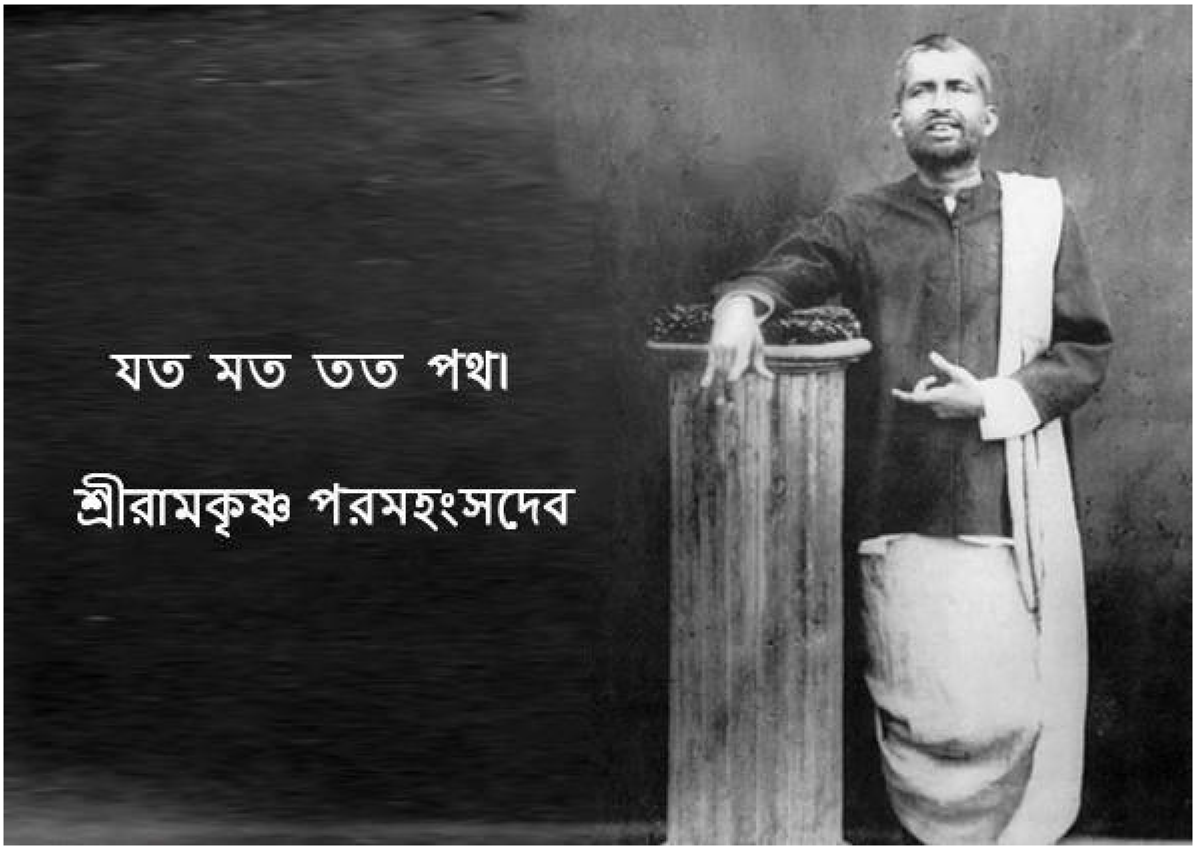

যত মত তত পথ -- সমন্বয়ের এই বাণীই মানবের চালিকা শক্তি।

অমিত সেনগুপ্ত

যত মত তত পথ এই প্রবাদ বাক্যটির প্রবক্তা পরম পূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। 'যত মত তত পথ' কথাটির অর্থ হল যতগুলো মত আছে, তার ততগুলোই পথ আছে। এই বাক্যটির মধ্যে লুকিয়ে আছে হিন্দুধর্মের/হিন্দু শাস্ত্রের অনেক রহস্য। এই সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার আগে ধর্ম শব্দের অর্থ কী, সেই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

'ধর্ম' শব্দটি সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ 'ধারণ করা'। ধর্ম কী ধারণ করে? যার দ্বারা নিজের এবং অপরের জীবন ও সমৃদ্ধি বিধৃত হয়, ধর্ম তা-ই ধারণ করে। ধর্ম (মানে কেবল মাত্র পূজা-পাঠ নয়) একটি সার্বজনীন ব্যাপার। এটি এমন একটি বিষয় যা সকলের কল্যাণসাধন করে।

ধর্মের দশটি লক্ষণ আছে। এখন দেখা যাক, ধর্মের এই দশটি লক্ষণ কী? ১) ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ২) ক্ষমা, ৩) দম (দমন), ৪) অস্তেয় (অচৌর্য), ৫) শৌচ (শুচিতা), ৬) ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ৭) ধী (বুদ্ধি), ৮) বিদ্যা, ৯) সত্য এবং ১০) অক্রোধ – এই দশটি-ই ধর্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ।

এই দশটি আচরণ যিনি পালন করেন, তাঁকেই ধার্মিক বলা হয়। তিনি হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন বা পার্সি যে কোন ধর্মমতেই বিশ্বাসী হন না কেন।

হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম সনাতন ধর্ম। উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু নদের উপত্যকায় যে জনগোষ্ঠী বসবাস করত, পরবর্তীকালে উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণকারী গ্রীকরা তাদের হিন্দু নামে অভিহিত করে। যদিও তারা সিন্ধু নদের উপত্যাকায় বসবাসকারী এই জাতিকে সিন্ধু

নামেই ডাকতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। স'-কে 'হ' উচ্চারণ করত। সেই থেকেই সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা 'হিন্দু' নামে পরিচিতি লাভ করে। এরা যে ধর্ম আচরণ/পালন করত তা-ই সনাতন ধর্ম বা বেদের ধর্ম বা বৈদিক-ধর্ম নামে খ্যাত। সাধারণভাবে একেই 'হিন্দুধর্ম' বলা হয়। কালক্রমে এই জনগোষ্ঠী সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবেই 'হিন্দুধর্ম' বা 'সনাতন ধর্ম' বিস্তার লাভ করে।

'সনাতন' শব্দের অর্থ – 'যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে'। 'সনাতন ধর্ম' বলতে আমরা সেই ধর্মকেই বুঝব যা ধর্মের উপরিলিখিত এই দশটি লক্ষণকেই আচরণে প্রকাশ করে এবং পালন করে। এই ধর্মের মূল আশ্রয় বেদ। 'বেদ' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান'। বেদকে 'অপৌরুষেয়' এবং 'শ্রুতি' বলা হয়। 'অপৌরুষেয়' এইজন্যে যে এই জ্ঞান কোন ব্যক্তি বা পুরুষবিশেষের বুদ্ধির দ্বারা অর্জিত ও প্রচারিত নয়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বহু ঋষির হৃদয়ে অনুভব বা উপলব্ধিরূপে সেই জ্ঞান উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এবং 'শ্রুতি' এইজন্যে যে যখন লিপির আবিষ্কার হয়নি, সেই সময় উপলব্ধ জ্ঞান মুখের ভাষায় পিতা থেকে পুত্র, গুরু থেকে শিষ্যে পরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হত।

অনুমান করা যায় যে, সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ যখন থেকে মানুষ তার দ্বিপদ পশুত্বকে অতিক্রম করে চৈতন্যের আলোয় নিজেকে আবিষ্কার করতে শুরু করল, তখন থেকেই সেই আচরণ গুলিকে মনুষ্যত্বের লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। 'মানুষ' শব্দের অর্থ মননশীল জীব (যার মান এবং হুশ, দুই-ই আছে)। মানুষ যেদিন থেকে 'মানুষ' হয়েছে, অর্থাৎ মনন করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই তার মনে প্রশ্ন জেগেছে – 'আমি কে?' 'আমি কী?' 'আমি কেন?' এই মূল দার্শনিক প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সমগ্র বেদে। সমগ্র বেদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকান্ড এবং জ্ঞানকান্ড।

সমাজভুক্ত ব্যক্তি ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় অগ্নিহোত্রাদি এবং যাগ-যজ্ঞাদির বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও মন্ত্রাদির বিবরণ আছে কর্মকান্ডে। এবং জীবনের মূল রহস্যের অনুসন্ধান, দার্শনিক প্রশ্নের আলোচনা ও সমাধান আছে জ্ঞানকান্ডে। বেদের এই ভাগটি (জ্ঞানকান্ড) সাধারণত 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। (উপনিষদ মানেঃ উপ=উপস্থিত বা সম্মুখে, নি=নিশ্চিত রূপে এবং সদ = সত্য।)

'বেদান্ত' শব্দের অর্থ বেদের অন্ত। 'অন্ত' শব্দের দুইটি অর্থ হতে পারে। এক – শেষ এবং দুই – নির্যাস। উপনিষদ্গুলি সাধারণত বেদের শেষ অংশে থাকায় এবং বেদের সার বা নির্যাস উপনষদে নিহিত আছে বলে সেগুলিকে বেদান্ত বলা হয়। বেদান্ত কেবল মাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি দর্শন-ও। অন্যভাবে বলা যায়- বেদান্ত একই সঙ্গে দর্শনও বটে আবার ধর্মও বটে। বেদান্ত একটি সর্বজনীন ধর্মের দর্শন, সেই ধর্মেরই নাম সনাতন ধর্ম। যে ধর্ম অন্য কোন ধর্মকে বা মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় না।

বেদ অর্থাৎ বৈদিক-ধর্ম অপৌরুষেয় হলেও পৃথিবীর অনেক ধর্মই ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা বিশেষ যুগে, বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে, বিশেষ জনগোষ্টির জন্যে প্রচারিত, অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সমস্ত প্রচারকই মহান ব্যক্তি এবং বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠীর অশেষ কল্যাণসাধন করেছেন। এঁরা যা বলছেন তার মর্মের সাথে সনাতন-ধর্মের সারসত্যের কোন ভিন্নতা নেই। কিন্তু মূলত যুগোপযোগিতার অর্থাৎ কালের বা সময়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে, আমার মতে এই গুলিকে ধর্ম না বলে ধর্মমত বলাই সঙ্গত হবে। ধর্মমত কালভেদে যুগোপযোগিরূপে সংশোধিত না হলে কোন কোন সময় (যা ইদানিং প্রায়-ই দেখা যায়) একটি বিশেষ মতাবলম্বী জনগোষ্টীর মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় এবং সমাজকে বিপন্ন করে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন অ-সনাতনী (সঙ্কীর্ন) ধর্মমতে বিশ্বাসী ব্যক্তি, অসৎ উদেশ্য ও অজ্ঞানতা বশত অন্য ধর্মকে এবং সম্মানিত মহাপুরুষদের নিন্দা করে থাকে। তারা ভাবে যে অন্যকে নিন্দা করে নিজেকে বড় করা যায়। কূপমণ্ডূকের মত তারা মনে করে যে, যে শিক্ষা তারা তাদের ধর্মমত থেকে পেয়েছে তার চেয়ে বড় শিক্ষা আর কিছুই হতে পারে না।

সম্প্রতিকালে এক বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত এবং কূপমণ্ডূক ব্যক্তিকে (অসৎ উদেশ্য ও অজ্ঞানতা বশত) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বিখ্যাত বাণী 'যত মত তত পথ'-এর অপব্যাখ্যা করতে দেখা গিয়েছে। সেই ব্যক্তি পরম পূজ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতাদর্শকে আক্রমণ করার পাশাপাশি, যে অঙ্গভঙ্গী করে কথাগুলি বলেছে, তা শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে গেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাথে সাথে সেই ব্যক্তি অসভ্য অঙ্গভঙ্গী করে স্বামী বিবেকানন্দেরও তীব্র নিন্দা করেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে না জেনে, তাঁর মর্মবাণী না বুঝে

অশিক্ষিতের মত আচরণ করেছে। আমি সেই কূপমণ্ডূক ব্যক্তির তীব্র নিন্দা করছি এবং সেই সঙ্গে এখানে আমি ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনলীলা বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কামারপুকুর গ্রামে। তিনি পাঠশালায় গিয়েছিলেন কিন্তু কখনই প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হননি। তিনি চেয়েছিলেন নিজের মত করে শিক্ষা অর্জন করতে। নিজের মত চারুকলা, মূর্তি গড়ার কাজ, ধ্যান যোগ ইত্যাদি সুকর্মে নিজেকে চালিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধু সংঘ করতেন এবং তিনি খুব সহজ সরল ভাবে মানুষকে তার কথা বোঝাতে পারতেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বিখ্যাত নরেন্দ্রনাথ দত্ত। যিনি যুক্তিবাদী জ্ঞানবাদী একজন মানুষ ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শিক্ষায় তথা দীক্ষায় নরেন্দ্রনাথ হয়ে উঠেছিলেন পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ এবং তাঁর মতাদর্শ প্রচার করেন (শ্রীরামকৃষ্ণের অনুসারে), সব ধর্মের লক্ষ্য এক। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য কোন ধর্মকে আঘাত না করে তার বাণীগুলি, তার ধর্ম মতের সারতত্ব গুলি মানুষের সামনে তুলে ধরতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন 'যত মত তত পথ'। অর্থাৎ ধর্ম আলাদা আলাদা হলে তার পথও আলাদা হবে। কিন্তু তার যে মূল লক্ষ্যটা কিন্তু এক। তা হল ঈশ্বর দর্শন এবং ঈশ্বর প্রাপ্তি। 'যত মত তত পথ' বাণীর মধ্যে এটা বোঝানো হয়েছে যে আমরা যেই পথ দিয়েই যাই না কেন অথবা যেই মত দিয়ে যাই না কেন, তার অন্তিম উদ্দেশ্য হলো – ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বর প্রাপ্তি।

তিনি বলেছেন, একটি পুকুরে বিভিন্ন জন বালতি নিয়ে জল আনতে গেছে। একজন ব্যক্তি বলছে জল। কিন্তু আরও একজন বলছে পানি, অন্য একজন বলছে ওয়াটার আর অন্য একজন বলছে এ্যাকোয়া, বস্তুটা এক হলেও বস্তুটার নামই শুধু আলাদা। তেমনই, কেউ বলে ভগবান, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ঈশ্বর আবার কেউ বলে গড।

আমাদের শাস্ত্রে আছে, সত্যি বস্তু বা পরম তত্ব এক হলেও নানাভাবে তার বর্ণনা করা হয়। বিভিন্ন শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয় বা মতের সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেগুলি সমস্ত যে ভুল মত তা বলা যায় না। কারণ সেগুলির মধ্যে পরম সত্যের কোনো না কোনো দিক প্রকাশ পেয়েছে/পায়। এই সমস্ত মতই পরস্পরের (একে অপরের) পরিপূরক। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্ধের হাতি দর্শনের উদাহরণ দিয়েছেন। কয়েকজন অন্ধ অনুভব করছে হাতির স্বরূপ। একজন অন্ধ বলছেন হাতি কুলোর মত, কেউ বলছে ডালার মত আবার কেউ বলছে না না হাতি থালার মত। আরো একজন অন্ধ বলছে হাতি পাইপ এর মত। এইসব ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই ঠিক বলছে কিন্তু তা হল কেবল আংশিক সত্য।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শুধু হিন্দু ধর্মমতভিত্তিক সাধনাতেই নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি, তিনি ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের আরাধনা পদ্ধতিতেও আরাধনা করেছেন। এবং তার মূল জানার চেষ্টা করেছেন। একই সঙ্গে তিনি হজরত মোহম্মদ এবং যিশুখ্রিষ্ট প্রবর্তিত ধর্মীয় ধারাতেও ঈশ্বরকে উপলব্ধি করেছেন। তাই তাঁর মতে, **'সকল ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ।'**

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন লোকগুরু। তিনি ধর্মের কঠিন তত্বকে সহজ করে বোঝাতে পারতেন। তিনি বলতেন, ঈশ্বর রয়েছেন সকল জীবের মধ্যে, তাই জীবসেবাই ঈশ্বরসেবা। তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মীয় আদর্শ প্রচার করে বলেছেন –

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা
খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন
সেবিছে ঈশ্বর"

রামকৃষ্ণের উদার ধর্মীয় নীতির প্রভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবাদর্শে মোহগ্রস্ত অনেক শিক্ষিত যুবক ভারতীয় আদর্শে ফিরে আসেন। তিনি যেমন বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে যেতেন, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্তিবর্গও তাঁর কাছে আসতেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, কেশবচন্দ্র সেন, মহেদ্রনাথ সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষসহ আরও অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এমনকি ফরাসি মনীষী রোম্যা

রোলাঁ এবং জার্মান মনীষী ম্যাক্স মূলারও ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণের গুন-মুগ্ধ ভক্ত।

'যত মত তত পথ'। এই কথাটির মধ্যেই ভারতবর্ষের হাজার হাজার বছরের ধর্মতত্ব লীন হয়ে আছে। এমন উদার সমন্বয়ের কথা জগতে আর দ্বিতীয়টি নেই। হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে ভারতের ধর্মচর্চা, ধর্মস্রোত। নানা তত্ব নানা পথের পথিকরা জলসিঞ্চন করেছে এই স্রোতে। সে সমূহ জ্ঞানরাশির, সেই শাশ্বত উপলব্ধির সারাৎসার যদি কোথাও ধরা দেয়, তবে তা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথাতেই মেলে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতবর্ষের সমগ্র অতীত ধর্মচিন্তার সাকার বিগ্রহ স্বরূপ।'

আমদের ধর্মচিন্তার অতীতের দিকে যদি আমরা চোখ মেলি, তবে আমরা দেখব, বিভিন্ন সময় কত না মত ও পথ এসছে এই ধরাধামে। সেই সব মত ও পথের পথিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধিতাও ছিল। ক্রমে এসেছে নানা ধর্মের বিভাজন। নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে চলেছে বহু চাপানউতর। আর এই সব কিছু অতিক্রম করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের দিলেন সহজতম শিক্ষা। শুধু কথার কথা নয়। নানা পথ ধরে সাধনা করলেন তিনি নিজে। সিদ্ধিলাভ করে আমাদের শেখালেন মূল কথাটি। বললেন, সব পথ ধরেই তিনি হেঁটে এসেছেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান আবার শাক্ত, বৈষ্ণব বেদান্ত – সব পথেই সাধনা করেছেন তিনি। আর দেখেছেন সব পথেরই শেষে ঐ একই ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। পথ ভিন্ন হলেও সবাই এসে পৌঁছোচ্ছেন সেই একই বিন্দুতে। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি, তিনি এই কথাটি উপলব্ধি করেন। আর যিনি ভেদাভেদ করেন, যিনি কূপমণ্ডূক, তাঁর জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন হয় না।

ঠাকুরের শিক্ষা দেওয়া এই উদার ধর্মমতই আমাদের জীবনের ধর্মচিন্তার সারাৎসার। শ্রীমদ ভগবত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সব পথ এসে তাঁর কাছেই মিলেছে। শ্রীরামকৃষ্ণও একই কথা বলেছেন। আজ ধর্ম নিয়ে, মত ও পথ নিয়ে যত বিভাজন আমরা করি না কেন, ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর আসল কথাটি কিন্তু এই সমন্বয়, এই উদারতার ভেতরেই নিহিত আছে শিব জ্ঞানে জীব সেবা।

Stay Authentic

Shovik Nandi

"How was the Super Over, Gup!?" "I'd rather not talk about it…" he walks away. Yes, I did that. Let's rewind to May 2018. I came across a job vacancy on Seek for the role of Marketing and Events Manager at Auckland Cricket - I decided to give it a shot. To my surprise, I received an interview invitation from the recruitment agency about two weeks later. The initial stage of the process involved a phone interview, then I managed to make it to an in-person meeting at Eden Park thereafter. I vividly recall walking into the Eden Park Board Room and noticing the photograph of Grant Elliot's six from the World Cup Semi-Final – I was there, in the South Stand, cheering for the BLACKCAPS' in what was the best LIVE sporting event I've ever attended.

Back story – growing up, escaping cricket was unimaginable. Truly. Baba is an extremely passionate cricket follower, spectator, and a very good player. While my Dadai may not have been a cricketing maestro (according to Baba anyway), he was an avid enthusiast – who followed the game very closely. Cricket surrounded me throughout my upbringing in Karunamoyee, Kolkata. It was my means of connecting with friends and neighbours on our street. Our residence was a *paanch-tola* apartment building in B Block, Salt Lake, featuring a small communal front yard. The iron railing entry gate about two-thirds of the way up served as our cricket stumps. Anything that hit the adjacent buildings, windows, or the houses of our neighbours on the full, was out. Each day, whether in the morning or post the afternoon sun, was an opportunity to bond with the neighbours and play cricket. Everyone around the neighbourhood recognized me, mostly for being out and about playing the game. The makeshift wickets transitioned from the iron-clad gate to the headlights of Baba's Maruti mini-van or the concrete apartment walls - with red soil stones etched onto the wall as wickets. Indoors, cricket remained a constant presence on the telly. We relocated from Kolkata to Delhi for about two and a half years, followed by a similar stint in Mumbai, and subsequently, a year in Kuwait. Through all these changes, one element remained consistent – cricket and its ability to connect me with people. Whether it was playing in scorching 55-degree heat in Kuwait, watching on TV, or engaging in book cricket (one of my favourite pastime games), cricket was an inescapable part of my life. That's where I come from.

Fast forward to the Auckland Cricket interview. My aim was to encapsulate all my childhood memories within a 45-mins timeframe while placing more emphasis on my work experience in marketing than on the sport itself. Maintaining focus beyond cricket became challenging. Especially with Grant Elliot's photograph looming large in the Eden Park Boardroom. I didn't fit the mould of a typical marketing professional. Instead, I began my journey as a Graphic Design graduate after having briefly ventured into a year of Engineering before discovering my passion for storytelling about everyday life. I identify myself as a creative storyteller.

During the interview, I concentrated on responding to the questions without overthinking. I candidly shared my journey as a Marketer and Storyteller, intertwining it with my knowledge of cricket, which, to be honest, was a secondary requirement for a Marketing and Events role at Auckland Cricket. It was more of a good-to-have. I discussed my experience as the captain of the Probasee Bengalee cricket team, which I led for seven years during the Spirit of Cricket Tournament. I highlighted how my approach revolved around creating an environment where teamwork was at the forefront - where everyone felt their contribution was valuable, contributing to collective success. On the field, my ultimate aim was to try and make sure that everyone gave their best effort, regardless of the result. It is something I take great pride in – giving my all, whether on the cricket field or at work. To put it simply, I told them

that I was a creative problem solver and focussed on the need to tell stories. Better. Somehow, I managed to connect the dots and effectively convey my ideas during the interview. A week later, the recruiters informed me that I was the preferred candidate.

On my first day at work, I toured the facilities and met everyone in the office, including the players. It's easy to underestimate the significance of meeting players you've only seen on TV. Being introduced as an employee alongside some of the country's biggest cricketing names can be intimidating. My Indian upbringing added an extra layer of awe. In my second week, I received Instagram follow requests from Lockie Ferguson, Mitch McClenaghan, Colin Munro, and Jeet Raval. I pondered on how best to interact with these individuals – should I be myself or adopt the Auckland Cricket professional tone (whatever that was!)? Initially, I grappled with this decision. I'll readily admit that I tried way too hard to relate to them on many fronts, attempting to fit in and become a part of the group. Looking back, I cringe at some of the things I said six years ago. However, one aspect remained consistent – the fresh approach I brought to Auckland Cricket. My fascination with storytelling and my commitment to figure out approaches in an attempt to excel in my role were my primary motivations. My upbringing had instilled in me the ability to adapt to ever-changing environments, which proved beneficial in acclimatising to life at ACA. I developed strategies for engaging with high-profile personalities, treating them as everyday colleagues rather than being fixated solely on their cricketing prowess. I was making progress. Now, fast forward by two months. Arguably (need to include that caveat), New Zealand's greatest limited-overs batsman, Martin Guptill, returned from a tour, and I spotted him at the indoor training centre. Everything that I had learned in the past few weeks deserted me. And I found myself standing in front of him while he was engrossed in his workout. Normally, I respected players' personal space, especially during workouts and especially when they had headphones on. But not this time. I introduced myself, my role at Auckland Cricket and shook hands with him, which went well initially. However, I didn't know how to continue the conversation or what to say next. Few awkward moments of silence ensued before I decided to step away and allow him to continue his workout.

One of the most enjoyable moments of my first year was overseeing Super Smash, the televised domestic T20 competition. During that season, we recorded the highest attendance numbers in many years. It was gratifying and reassuring to witness the strong connection between Aucklanders and the sport, with many turning out to show their support.

In the summer of 2019/20, my second year, I felt more at ease in my role and started gaining confidence in implementing my own ideas/initiatives that aligned with my beliefs about community engagement. This was also the year when Team India had visited our shores in summer. For this special tour and to enhance engagement with the Indian community and our domestic calendar, we orchestrated an India cultural day at the Outer Oval as part of the Super Smash festivities, ahead of the international fixture. This event featured Indian curries, traditional music, and dhol performances. Introducing theme days at the Super Smash proved to be successful, and the outreach to Aucklanders was well-received. We had Pasifika performances, engaged with a retirement village to provide them with a matchday experience at our First-Class fixtures, and celebrated a day dedicated to women leaders during the Super Smash. I stuck to my strengths – celebrating and showcasing stories to connect with more Aucklanders.

While everything was progressing well, interacting with Martin Guptill remained somewhat intimidating for some reason. Maybe it was because he wasn't much of a talker, maybe it was because he was one of the cricketing greats, or perhaps it was the childhood excitement of seeing a true legend in person that caused the occasional hiccup and awkward moments.

Fast forward to a get-together with the Auckland Aces team after the 2019 World Cup. The Super Over finish at the World Cup Final with England had the entire nation on edge, especially Guptill. I approached him again, asking, "Hi, how are you?" He replied, "Good." Knowing the background, you don't need to look too far to see that he was absolutely distraught after the World Cup – the whole nation was. In particular, it was the Super Over that hurt the most. And there I was, without fully realising what I had asked, "Mate!" I said. "Talk us through that Super Over - how was the atmosphere, how did it feel?" Without understanding the gravity of the question, that marked the end of our conversation that day. "I'd rather not", he replied. To this day, I still cringe hard at that moment.

Switch to the end of the 2019/20 summer – in Wellington. Auckland vs. Wellington, Super Smash finals. Unfortunately, Wellington emerged victorious. I headed over to the players' sheds to join in the post-match gathering. I tried to match the professional cricketers' drinking limits. I went around the group, and that is probably when I had my first ever authentic conversation with Gup. I remember, after about four beers, a couple of rum and cokes, and who knows what else, approaching him for a proper conversation, just like I would with anyone else I interacted with. I wanted to present an authentic

version of myself. I admitted that I found it most challenging to approach him and initiate a conversation, often feeling star-struck. I told him I still had no idea why I brought up the Super Over in my third conversation with him. For the first time, we had a normal conversation, just like I would with anyone else. It was empowering to feel comfortable without trying to be a version of myself that I wasn't. I was simply being me, with all my flaws and weaknesses, sprinkled with a few cheeky comments – and it worked.

A few months after that, I directed a documentary-style feature on Martin Guptill's journey from his Auckland club in Suburbs New Lynn to becoming a limited-overs cricket legend. It was a showcase feature for one of our sponsors, Kookaburra. Since then, every time I saw him, I tried to maintain authentic, concise conversations, primarily centred around topics I genuinely believed in or valued. Today, he's just a text message away, and we have *authentic* conversations every time we meet, often accompanied by genuine banter. We've hung out a few times with Laura McGoldrick (his wife), Lana, and I after our Auckland Cricket awards – Laura hosts our annual awards evening.

Stay authentic. This is a philosophy I strive to implement in everyday life, whether at work, at home, with friends, or with family. To be true to who I am – an authentic, imperfect version of myself, but an unwaveringly passionate creative storyteller, who tries everything to be a better version today than yesterday. I feel privileged to have a small part to play in shaping NZ's cricketing future and am learning every day at the job.

Six years on at ACA, I'm now a part of the Senior Leadership Team as the GM Marketing and Relationships. I've also served as the Acting CEO for Auckland Cricket, all while endeavouring to stay true to myself and my authentic style.

Tell that to the six-year-old Pupum, playing outside with people from the neighbourhood in Karunamoyee, while Dadai watched on from the white iron grill windows, and a much younger Baba, with almost a full head of hair, stood at the batting crease – my overarching philosophy remains unchanged: to connect with people and communities through my passion and something I genuinely believe in.

And try to veer away from any Super Over related chats with cricketers!

Kolkata Special Chicken Cutlet

Recipe by: Raima Roy

Chicken Cutlet in Kolkata is a popular street food. It is crispy-crunchy on the outside and deliciously spiced and succulent on the inside. These Kolkata style crispy fried chicken cutlets are my favourite snack as not only are they delicious but they can be made ahead of time and frozen, making life easier.

Durga puja for me is incomplete without these delicacies. Since we don't get it here, my mum obviously had to replicate this chicken cutlet for the whole family to enjoy at this time of the year. I've learnt the magic recipe from my mum.

Preparation time: 45 minutes

Ingredients/ Utensils:

- Large bowl
- Frying pan
- 500 gms Chicken Mince (you can make chicken mince with boneless chicken and simply grind it in a blender)
- 1 1/2 tbsp Ginger (finely grated)
- 1 1/2 tbsp Garlic (Finely grated)
- 1 tbsp Lime juice
- 1/2 tsp Black pepper powder (Freshly ground)
- 1/2 tsp Bengali Garam Masala (1 inch cinnamon + 7-8 green cardamom + 7-8 cloves) (Roasted and Freshly ground)
- 1 tsp Chilli powder
- 2-3 Green chillies (finely chopped)
- 2-3 tbsp Coriander leaves (Finely chopped)
- Salt (as per taste)
- 3 large Eggs
- 300 gms Bread crumbs
- Veg oil to fry the cutlets

1. In a large bowl add chicken mince, lime juice, grated ginger, grated garlic, chillies, coriander leaves, chilli powder, black pepper powder, garam masala powder and salt and mix and combine everything well with hands and keep the marinated chicken mince aside.
2. While the chicken is resting let us get the rest of the things ready. Beat the eggs in a flat dish and spread the bread crumbs in a large plate.
3. You can make 6 large chicken cutlets easily with this amount of chicken (as mentioned here). But you can make 12-14 small cutlets too.
4. Now it is time to shape the cutlets. Take a ball of the marinated chicken mix, slowly flatten and shape them into a thin diamond or square shaped cutlet or as per you desire (traditionally bengali chicken cutlets are diamond shaped) and coat them with a thin layer of bread crumbs. Follow this procedure until all the chicken mix is used up.
5. Now carefully dip the shaped chicken cutlets in the egg and coat them well.
6. Place it carefully on the plate of bread crumbs and coat it uniformly with it. At this point you can pack it and place it in the freezer to fry and enjoy later.
7. Heat oil in a frying pan or skillet and fry the chicken until crispy and golden brown on both sides.
8. Serve it with Kasundi or tomato ketchup along with a side of salad and masala chai.

অবসর জীবন

অরবিন্দ রায়

এক দিন সকাল বেলায় চেয়ারে বসে চা পান করছি। চোখের নজর চলে গেল সামনের ছোট্ট বাগানটির দিকে। দেখছি এক ঝাঁক চড়াই পাখি মনের আনন্দে গলা দিয়ে শব্দ করছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে প্রদত্ত খাবার খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। লক্ষ করলাম একটি পাখি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। সে অন্য পাখিদের মত ছুট্ ফট্ করতে পারছে না। গুটি গুটি করে হেঁটে বেড়াচ্ছে। খাবারের কাছে যেতে সাহস হচ্ছে না তার। হঠাৎ একটা জোরে কিসের যেন শব্দ হতেই সব চড়াই পাখি এক সাথে উড়ে চলে গেল। আর তখন ওই পাখিটি আস্তে আস্তে এগিয়ে খাবার খুঁটে খুঁটে খাওয়া শুরু করল। একটু পরে একটা বড় খাবারের টুকরো মুখে নিয়ে উড়ে চলে গেল। চা পান করতে করতে ভাবলাম পাখিটির নিশ্চয় বয়স বেশী হয়ে গেছে। তাই তার নড়া চড়া কমে গেছে। সে আর আগের মতন অন্যদের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না। এবার কী হবে তার ? কে তর দেখাশোনা করবে ? কে তার জন্য খাবার এনে দেবে ইত্যাদি। ভাবতে ভাবতে মনটা যেন কোথায় চলে গেল। বুঝতেই পারলাম না কতটা সময় বসেছিলাম। কিন্তু সেই ভাবনা কিছুতেই আমার পিছু ছাড়ছে না।

ঘরে এসে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলাম। যা মাথায় ঘুরছে লেখবার চেষ্টা করলাম। সকাল বেলার ঘটনা চোখ খুলে দিয়েছে। ভাবতে শিখিয়েছে আমায়। আমরা সবাই জানি প্রত্যেক মানুষের জীবনে অতি সাধারন দিনের মধ্যে কয়েকটি দিন তার জীবনে বিশেষ দিন হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন মাতৃ গর্ভ হতে ভুমিষ্ঠ হয়ে প্রথম সূর্যের আলো দেখবার দিন, বিদ্যা আরম্ভ যার কোন শেষ বা অবসর হয় না, যতদিন জীবন ততদিনই

বিদ্যা অর্জন, আর্থিক আয়ের বাধ্যতামূলক কর্মজীবন, শুভ পরিনয়, বাধ্যতামূলক কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহন এবং সব শেষে মূল্যবান জীবন থেকে চিরতরে ভগবানের চরনে নিজেকে সমর্পন।

জীবনের এতগুলো কর্মকান্ডের মধ্যে, আর্থিক আয়ের বাধ্যতামূলক কর্মজীবন থেকে নিস্তার অর্থাৎ অবসর জীবন নিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতে, পাঠক বৃন্দের কাছে মন আজ ব্যাকুলতা অনুভব করছে।

অবসর কথাটি জীবনের নানা কর্মকান্ডে ব্যবহার করা যায়। তবে সাধারনতঃ কর্মজীবন থেকে নিস্তার বা বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রেই অবসর কথাটির ব্যবহার বেশী হয়ে থাকে। দীর্ঘ কর্মজীবন থেকে বেরিয়ে আসা নিয়ে আমরা বিভিন্ন রকম অনুভূতির সম্মুখীন হই। দেখা যায় কিছু মানুষ তার বিশাল কর্মজীবনে নিজের সম্বন্ধে অভ্যাসে পরিনত হওয়া গুরুগম্ভীর মনভাব নিয়ে অবসর গ্রহন করেন। বহু বছর ধরে কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার জন্য যে কর্মক্ষমতা ও কার্মদক্ষতা অর্জন করেছেন, অবসর সেখানে যেন তাকে অবসানের ঘ্রান অনুভব করায় এবং সামাজিক পরিচিতির বাঁধন আলগা করায়। অবসরকে মনে করেন জীবন থেকে নির্বাসন। অবসরের আগে এবং পরে জীবনের মূল্যায়ন এক রকম থাকে না। কথার অর্থের বদল হয়, কখন বোঝার ভুলে, কখন তার গাম্ভীর্যের অধিকারে। এই ক্ষেত্রে অবসরের আগে জীবনে একটা অজানা ভীতি থাকে। অবসর জীবনটা কেমন হবে? সব কিছু মানিয়ে চলা যাবে তো? পরিচিত মানুষজন আগের মত ব্যবহার করবে তো ইত্যাদি।

ধরাযাক এই ক্ষেত্রে অবসরের প্রথম দিনের কথা। সকালে কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সেই তাড়া নেই। সারাদিনের ব্যস্ততার কর্মকান্ড মনে করার প্রয়োজন নেই। কাজের কৈফিয়ৎ দেবার বা চাইবার সুযোগ নেই। কর্মক্ষেত্রের মত চার পাশে মানুষজন নিয়ে চলার প্রশ্ন নেই ভেবে, তিনি নিজেকে অসহায় এবং সময়টিকে অসহনীয় মনে করেন। ফলে "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" হয়ে কিছু অপ্রয়োজনীয় কাজ করে ফেলেন। সেই নিয়ে বাড়ীতে কথা হলে তিনি মনে করেন তাকে অসম্মান করা হয়েছে। কর্মজীবনের গাম্ভীর্য থেকে সরে আসতে পারেন না, নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। শুধু তাই নয় হয়তো প্রকাশ ক'রে ফেলেন। একই ঘটনা যদি কর্মজীবনে থাকতে ঘটত, তিনি হয়তে হাল্কা ভাবে নিতেন। যেহেতু অবসরে আছেন, সর্বক্ষন একটা হীন মন্য বোধ তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। শত চেষ্টাতেও সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। যে সম্মান নিয়ে তিনি তার কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন, অবসরের পরেও ঠিক সেই সম্মান আশা ক'রে থাকেন। এমনও হয় নিজের বোঝার ভুলে নিজেই কষ্ট পান। ধীরে ধীরে কখন যে আপনজনেদের কাছ থেকে দূরে চলে গেছেন টেরও পান না। ক্রমে অবসাদ তাকে ঘিরে ধরে এবং শরীরে নানা রোগ বাসা বাঁধে। জীবনে বিয়োগের ভার বাড়তে বাড়তে হঠাৎই শেষ বারের মত নিঃশ্বাসের ক্ষন এসে দরজায় কড়া নাড়ে।

অন্য চিন্তায় থাকে কর্মজীবনে বহু লড়াই ক'রে নিজের উন্নতি সাধন এবং অমানুষিক পরিশ্রম করার যে কর্মকান্ড, অবসর তার থেকে

নিদ্রার বা মুক্তির আস্বাদন করায়। যিনি অবসরকে বাধ্যতামূলক কর্মজীবন থেকে মুক্তি মনে করেন তার কাছে এটা আশাতীত, তার বাকি জীবনের জন্যে শান্তির আয়োজন। অবসরকে সাদরে আহ্বান ক'রে নতুন কর্মসূচী তৈরী ক'রে, প্রথম দিন থেকেই নূতন ভাবে জীবনকে চালিত করেন। এতদিন তিনি দিনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সময় বাধ্যতামূলক কাজের জন্য দিয়েছেন। কাজের তাড়নায় নিজের জীবনের দিকে তাকাবার সময় পান নি। কিন্তু এখন পুরো দিনটাই 24 ঘন্টা তার একান্ত নিজের। জীবনকে জানবার, জীবনের মূল্যবোধ বোঝবার অবকাশ পাবেন। ইচ্ছে মতন হেঁটে বেড়াবার সময় পাবেন। পথ দিয়ে না হাঁটলে আশে পাশের মানুষ জনকে চিনবেন কী ক'রে?

এই প্রসঙ্গে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করি। বহু কাল আগের কথা। যতদূর মনে পড়ে 1955 সাল। ঢাকুরিয়া রামচন্দ্র বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেনীর ছাত্র ছিলাম। বর্ষাকালে একদিন অতি বৃষ্টির ফলে আমাদের শ্রেনীতে আমরা মাত্র 4/5 জন ছাত্র প্রায় স্নান করার মত বৃষ্টিতে ভিজে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। বাকি ছাত্ররা বিদ্যালয়ে আসতেই পারেনি। সেই দিনটা একটা মজার দিন ছিল। কারন কোন বইয়ের পড়াশোনা হয় নি। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত রবীন মিত্র ইতিহাসের মাস্টার মশাই এসে আমাদের সাথে বন্ধুর মত গল্প করলেন। আমাদের কথা শুনলেন। যাবার সময় বলেছিলেন জীবনে পড়াশোনা ছাড়া অন্য যে কোন একটি বিষয়কে "শখের পেশা" অর্থাৎ Hobby হিসাবে গ্রহন করতে হয়। যে বিষয়টি তোমার কাছে সহজ মনে হবে তাকেই চয়ন করে নিয়ে ভালবাসতে হয়। তাকে নিয়ে চর্চা করলে কখনো ক্লান্তি বোধ হয় না। তোমাকে আনন্দ দেবে। তোমার সুখ দুঃখের সাথী হয়ে থাকবে সারা জীবন। পরিশেষে অবসর জীবনের প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তোমাকে কখনও অবসাদে অগ্রসর হতে দেবে না। এই বলে তিনি চলে গেলেন। কথাগুলো শুনে আমরা দুমিনিট কোন কথা বলতে পারিনি। মনে মনে ভেবেছিলাম স্যার আমাদের মাথায় একটা নতুন জগতের বীজ বপন করে দিয়ে গেলেন।

আবার আগের প্রসঙ্গে যাই। অবসরের প্রথম দিন সকালেই দেখতে পাই তিনি আনন্দের সাথে স্বস্তির ভাব নিয়ে রয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে যাবার তাড়ানেই। তিনি এখন মুক্ত। তিনি অবসর জীবন ধারার পরিবর্তনকে সাদরে গ্রহন করেছেন। তাকে একটুও অগোছাল হতে দেখা যাচ্ছে না। এখন তার নিজেকে চেনবার সময়। এই চিন্তাধারার মানুষ এই বিশেষ দিনটার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। এবার তার সময় হয়েছে এই মুহূর্তগুলো উপভোগ করার।

জীবনে সব কিছুর অন্তিম সময় আসে। কোন কিছুই স্থায়ী নয়। নতুন কিছু শুরু হলে যেমন আনন্দ হয়, শেষ হলেও তেমনি কাম্য প্রসন্ন ভাবের। একটি শিশু যখন শৃংখলাবদ্ধ নিয়মের মধ্য্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রথম বার সূর্যের আলো দেখে, ঠিক তেমনি অন্তিম সময়ে শৃংখলাবদ্ধ নিয়মের মধ্য্য দিয়ে ভগবানের চরনে স্থান করে নেওয়া বলে দেয় জীবন তার সার্থক। একটা কথা সবাই জানি "যার শেষ ভাল তার সব ভাল"। শুধু মাকখানের পথটুকু কেমন করে পার হবেন সেটাই ভাবনার কথা।

সবার মঙ্গল কামনা করে শেষ বেলায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় স্মরন করতে চাই — "তোমার হল শুরু আমার হল সারা"

বিঃদ্রঃ - [অধ্যাপিকা ডঃ নীলাঞ্জনা সান্যালের (প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান, সাইকোলজী বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বক্তৃতা "অবসরের অবকাশ" শুনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই প্রচেষ্টা]

— o —

তুমি ছাড়া শূণ্য লাগে

রূপম চৌধুরী
চৌরঙ্গী

প্রথমেই জানতে হবে এই ‘তুমি’ কে? সুমন চট্টোপাধ্যায় এর তোমাকে চাই এর তুমি নাকি আয়ুব বাচ্চুর সেই তুমি? নাকি কলকাতা শহর - যাকে এই প্রবাসে থেকে আমরা সবসময় মিস্ করি? গিটারের তারে প্লেক্ট্রামের আঘাতে মহাকাশ চিরে যে চিৎকার হয়ে ওঠে, এবং গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে সেই তুমিকে কজন চেনে? ১৯৭৯ এর বাংলা গানের অ্যালবামে এরম পাঁচজন তুমি ছিল যাদের স্থান হয়েছিল সমালোচনার গিলোটিনে।

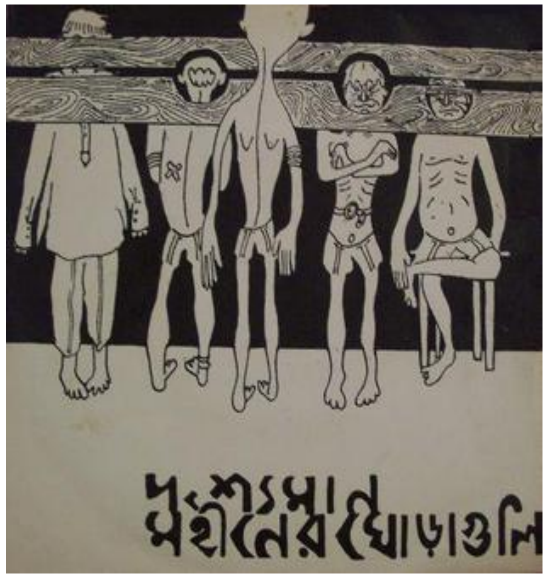

আমাদের তুমি এক বিদ্রোহ, একটা এ্যন্টি এস্টাব্লিশমেন্ট চিৎকার. সবাই বলে গানের ভাষা দরকার পরেনা, কিন্তু তাহলে নাক সিঁটকে ওঠে কোনো? ওঠাই ভালো, আমরা শান্তি পাই তাতে। commercialism-এর ভুয়ো মায়াজালে আটকে থাকিনা।

৬০-এর দশকে নক্সাল আন্দোলনের পরে শাসকের অধিপত্যের চাপে রাজনৈতিক আন্দোলন না করতে পেরে গানের মাধ্যমে বেরিয়ে আসলো প্রচুর অভিমান ।

“শুধু আজ নয়, প্রতিরাত
তোমাদের পরকাল ভেবে
তোমাদের কথা ভেবে ঘুমহীন রাত জাগি
নগরবাসীরা শোনো
তোমাদের অন্যায় আমাদের অবহেলা মিশে
কোন নরক মাতায় তা জানো কি?”

৭০-এর দশকে জন্ম নিল মহীনের ঘোড়াগুলি - বাংলা সংগীত জগতের এক যুগান্তকারী নাম । এখানে একটা জিনিস লক্ষজনক – blues music যেরকম শুরু হয়েছিল ক্রীতদাসত্বের বিরুদ্ধে, ঠিক সেরকমই বাংলা রক-এর বীজ ছিল আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। স্বাভাবিক ভাবেই, বাঙালি জানত না এই নতুন রকমের গানকে কীভাবে স্বীকৃতি দেবে – বাংলা গানের মঞ্চে দাঁড়িয়ে এরম বাদ্যযন্ত্র এবং এরম গান? একি অপসংস্কৃতি নাকি কলিযুগের শুরু? শুরু তো হলো, কিন্তু মহীনের ঘোড়াগুলি থেমেও গেলো সেই বাণিজ্যিক স্বীকৃতির অভাবে। তবে তারা একটা আগুন জ্বালিয়ে গেল।

শোনা যায়, তাদের পরে বাইসাইকেল এবং একা বলে দুটো ব্যান্ড তৈরী হয়েছিল এবং বাইসাইকেল একটি অ্যালবাম-ও প্রকাশ করেছিল যেটির আজ কোনো হদিশ নেই। একা অবশ্য কোনো অ্যালবাম প্রকাশ করেছিল বলে শোনা যায়নি। ১৯৮০-তে আরেকটি যুগান্তকারী ব্যান্ড এল - নগর ফিলোমেল - একটি ব্যান্ড যার প্রচুর স্বীকৃতি পাওনা আজও বাকি রয়ে গেছে। বাংলা গানের স্বর্ণযুগে কফি হাউস থাকতে পারে, বাংলা ব্যান্ডের জগৎ পেল 'বিজনের চায়ের কেবিন'-এর মতো এক অসামান্য গান। এই ব্যান্ড থেকে বাংলা সংগীত জগৎ পেল ইন্দ্রনীল সেন, ইন্দ্রানী সেন-এর মতো শিল্পীদের ।

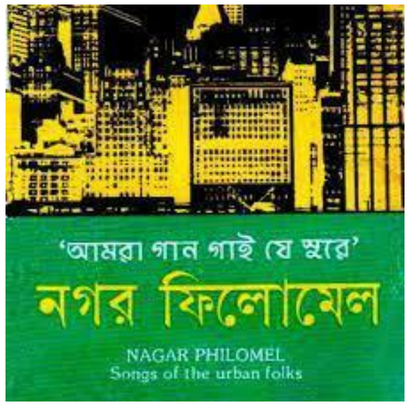

গৌতম চট্টোপাধ্যায় হয়ত চেয়েছিলেন মহীনের ঘোড়াগুলির প্রত্যেকটি ঘোড়াদের আবার এক করতে কিন্তু সেটা হয়নি - বরং তিনি নতুন প্রজন্ম নিয়ে কাজ শুরু করলেন এবং আরো একবার ইতিহাস রচনা করলেন মহীনের ঘোড়াগুলি সম্পাদিত অ্যালবাম 'আবার বছর কুড়ি পরে' প্রকাশ করে।

এর মধ্যে কিন্তু ৭০-এর দশকের সেই আগুন বিস্তর ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে অভিলাষা, ক্যাকটাস, লক্ষ্মীছাড়া, পরশপাথর, ক্রসউইন্ডজ, চন্দ্রবিন্দু - এর রূপে। বাংলা গান ঘুরে দাঁড়িয়েছে সুমন-অঞ্জন-নচি-র ছোঁয়ায়। প্রত্যেকটি ব্যান্ডের অ্যালবাম দৃঢ় ভাবে জাগিয়ে তুলেছে বাংলার সংগীত প্রেমীদের। এই ব্যান্ড গুলো মানুষের মনের কথা সহজেই বলে - রয়েছে রাগ, দুঃখ, ভালোবাসা, বিরহ - কিন্তু এক নতুন রূপে। ক্যাকটাস-এর হলুদ পাখি, পরশপাথরের ভালোলাগে, ভূমির বারান্দায় রোদ্দুর, এবং বিশেষ উল্লেখ করতেই হয় ক্রসউইন্ডজ এর অ্যালবাম পথ গেছে বেঁকে - যে অ্যালবাম ইতিহাস রচনা করেছিল।

২০০৩ সালে যখন আমার ১০৬.২ FM -এ কাজ শুরু করি, তখন রেডিও কলকাতায় খুব কম শোনা হোত এবং বাংলা ব্যান্ড পুরোপুরি ভাবে প্রধান-ধারার গান হয়ে উঠতে পারেনি - যদিও কিছু ব্যান্ড তখন কলেজ এবং নজরুল মঞ্চ-এ প্রচুর পরিমানে অনুষ্ঠান করছে। আমাদের স্টেশন ম্যানেজার সঞ্জয় আহমেদকে গিয়ে ফসিল্স শোনালাম - তিনি বললেন এই ব্যান্ডটি লোকে কতটা গ্রহণ করবে জানিনা কিন্তু একলা ঘর এবং হাস্নুহানা চালানোই যায়। একলা ঘর গানটি Chris De

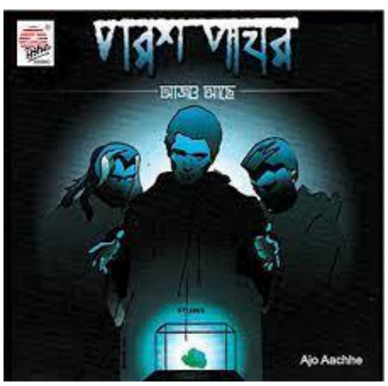

Burgh-এর একটি গানের বাংলা অনুবাদ (পরে কিছু মানুষ বলেছে ফসিল্স নাকি বাঙালিকে Chris De Burgh শোনা শিখিয়েছে - যেটি হাস্যকর মন্তব্য)

আমার FM-এর হাত ধরে প্রচুর শিল্পী উঠে এসেছিল - ফসিল্স, রূপঙ্কর, রাঘব চ্যাটার্জী, শুভমিতা, মনোময় ভট্টাচার্য্য আরো অনেকে। ৯০-এর দশকের কিংবদন্তি শিল্পীরাও একটি বিশাল মঞ্চ খুঁজে পেলো যেখানে নতুন বাংলা গানকেই অভিক্ষিপ্তাবস্থা দেওয়া হলো। মহীনের ঘোড়াগুলির জ্বালানো আগুন এখন এক অপ্রতিরোধ্য দাবানল! সেই দিনগুলো গৌতম চট্টোপাধ্যায় দেখতে পারেননি। ২০শে জুন ১৯৯৯ তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

কলকাতার নাকতলা একধরনের বাংলা ব্যান্ড-এর ঠেক বলা যায়। নাকতলা শুধু বাংলা রক নয়, বাংলায় metal-ও নিয়ে এসেছে। যখন ফসিল্স মানুষের কানে খুব কড়া, তখন নাকতলা থেকে আসে অমাবস্যা - বাংলার প্রথম metal ব্যান্ড। এরপর Nitric Dreams, Atmahatya এবং আরো অনেকে। আমরা তৈরী করি Naktala Metal Pally এবং নাকতলা উদয়ন সংঘে ঐতিহাসিক ওপেন এয়ার metal শো যেখানে ১০০০ এর বেশি মানুষ এসেছিলেন।

MY KOLKATA EDUGRAPH

The Telegraph online

Thursday, 21 September 2023

HOME OPINION INDIA MY KOLKATA EDUGRAPH STATES WORLD BUSINESS SCIENCE & TECH ENTERTAINMENT SPORTS

Home / West Bengal / A para of music and its precious metal

A para of music and its precious metal

Read more below

ARKA DAS | Published 13.04.10, 12:00 AM

*" The show was a tribute to Mohiner Ghoraguli founder Gautam Chattopadhyay, who hailed from the neighbourhood. "We had no sponsors. We basically organised the show with subscriptions, donations and with help from our friends. But even without any advertisement, we had a turnout of over 1000 people," recalls NMP president Roopam Chowdhury." – The Telegraph (*Published 13.04.10*)*

বাংলা ব্যান্ড-এর ইতিহাস খুব সংক্ষেপে লিখলাম - কিন্তু এর সাথে চৌরঙ্গীর কী সম্পর্ক? চেরা অঙ্গ থেকে আসে চেরাঙ্গি গ্রামের নাম যেটি পরে নামকরণ হয়ে চৌরঙ্গী। বাংলা ব্যান্ড যখন জনপ্রিয়তা লাভ করছে, তখন চৌরঙ্গীর এক সদস্য IIT -তে পিঙ্ক ফ্লয়েড গাইছে, আরেকজন ফ্রি স্কুল স্ট্রিট-এ পাইরেটেড বিদেশী ক্যাসেট কিনে গিটার বাজানো শিখছে, Someplace Else, নজরুল মঞ্চ চত্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আরেকজন সদস্য বাংলার প্রথম মহিলা drummer, চুটিয়ে অনুষ্ঠান করছে Cyanide Angels এর সাথে। যে যাই ভাষায় গান করুক না কেন, অনুপ্রেরণা কিন্তু বিদেশী নামের সাথে বাংলা ব্যান্ড এবং পাতি বাংলা ভাষায় বলতে গেলে তাদের রক্তে রক ভাসছে! চৌরঙ্গী শুরু Covid-যুগে। ভেবে দেখুন, আবার সেই দম বন্ধ থাকার পরিস্থিতে জন্ম, সেই blues-এর মতো। বাংলায় রক আমাদের আত্মার প্রতিচ্ছবি - এই জন্যে আমরা অন্য কোনো ভাষায় কোনোদিন কাজ করার কথাও ভাবিনা - আমাদের মনের মধ্যে জ্বলছে শুধু ৯০-দশকের নয়, সেই ১৯৮০-সালে মহীনের ঘোড়াগুলির জ্বালানো আগুন। মহীনের ঘোড়াগুলি দেখে মানুষ যেভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিল, আমাদের দেখেও ঠিক সেরকম প্রতিক্রিয়া হয়।

আমরা সেই আগুনের উত্তরাধিকারী, আমাদের গান আমাদের মনের রাগ, দুঃখ, কান্না, হাসি, ভালোবাসা, বিরহ প্রকাশ করে ঠিক সেই গিলোটিন বাঁধা ঘোড়াগুলির মতো। আমাদের গিটারের প্রত্যেকটা নোট সেলাম জানায় সেই কিংবদন্তী শিল্পীদের যারা এক্সপেরিমেন্ট করতে ভয় পায়নি। বাংলায় রক হয়। এক বিশ্বজনীন ভাষা মানুষের সব রকমের আবেগ তুলে ধরে। আমাদের গান আন্ডারগ্রাউন্ড অর্থাৎ niche। আমাদের গান যখন মানুষ শুনতে শুরু করলেন, প্রায় প্রত্যেকেই বলেছিলেন আমাদের একটি আলাদা মঞ্চ দরকার বিশেষ করে যে ধরনের গান আমরা করি, সেই গান একটি আলাদা নির্দিষ্ট মঞ্চ দাবি করে। এর থেকেই জন্ম 'Bong Konnection'-এর।

আমরা Australasia-র প্রথম ব্যান্ড যারা নিজেদের গানের অ্যালবাম প্রকাশ করেছি। অনেকে বলেছে আমাদের যে আজকাল কেউ CD কেনে না, সব অনলাইন। আমরা কিছু সীমিত সিডি বানিয়েছি যাতে আমাদের মাইলস্টোন-কে আমরা ছুঁয়ে দেখতে পারি। আজ যখন মহীনের ঘোড়াগুলি, নগর ফিলোমেলের গান গাই, আমাদের রক্ত গরম হয়ে যায়, এক উন্মাদনার ঝড় বয়ে যায় আমাদের শিরায়। Bong Konnection তৈরী সেই মানুষদের জন্যে যারা এই উন্মাদনার শিকার হয়েছে, সেই সব মানুষদের জন্যে যারা অনুভব করতে চায় বাংলা গানের এক নতুন অধ্যায়।

আপনারা যারা এসেছিলেন সেই কনসার্ট-এ তাদের আমরা রক সেলাম জানাই সেই সাহস এবং সমর্থন জানানোর জন্যে। জানিনা চৌরঙ্গী কতদিন থাকবে কিন্তু আমাদের একটিও গান যদি মানুষ মনে রাখে, যদি মনে রাখে যে কিছু মানুষ প্রবাসে ছিল যারা সাহস করেছিল কিছু আলাদা করার নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, সেটাই আমাদের পাওনা। ইতিহাসের পাতায় একদিন চৌরঙ্গী কেউ নিশ্চই খুঁজে বার করবে এবং ভালোবাসবে আমাদের বাংলা রক - খুঁজে পাবে আমাদের প্রিয় 'তুমি'-কে।

ART & PHOTOGRAPHY

by our talented members

Depiction of Ma Durga
Sujata Roy

Fusion of Alpana and Conch
Emili Biswas

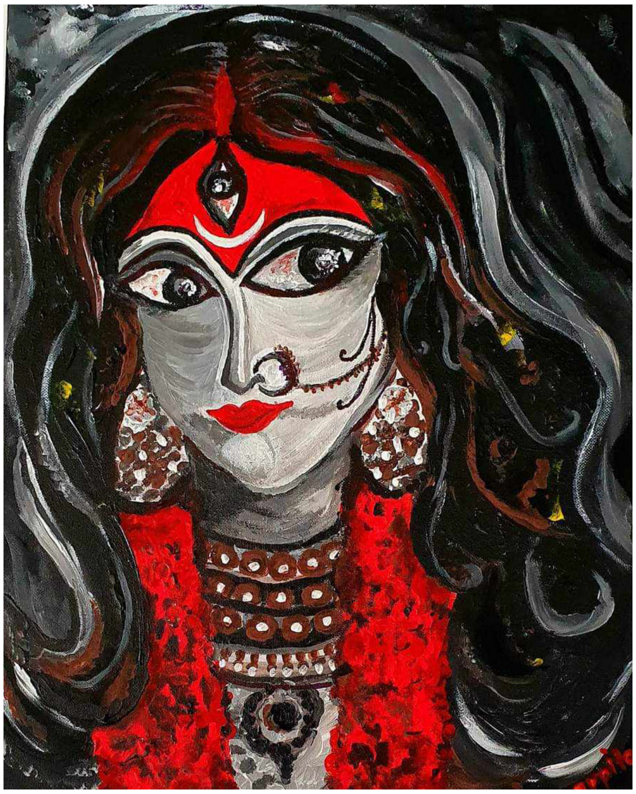

Modern Ma Kali
Arpita Chanda

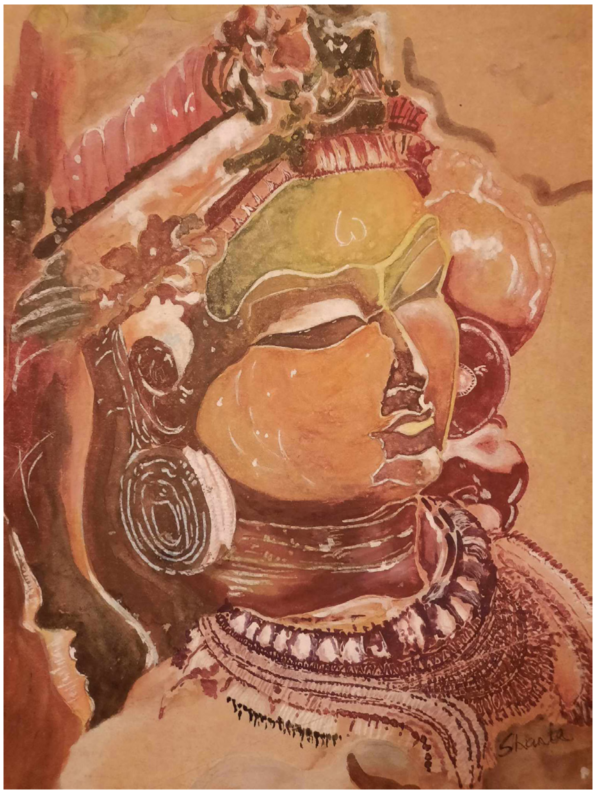

Watercolour Painting
Shanta Basu

ART & PHOTOGRAPHY
by our talented members

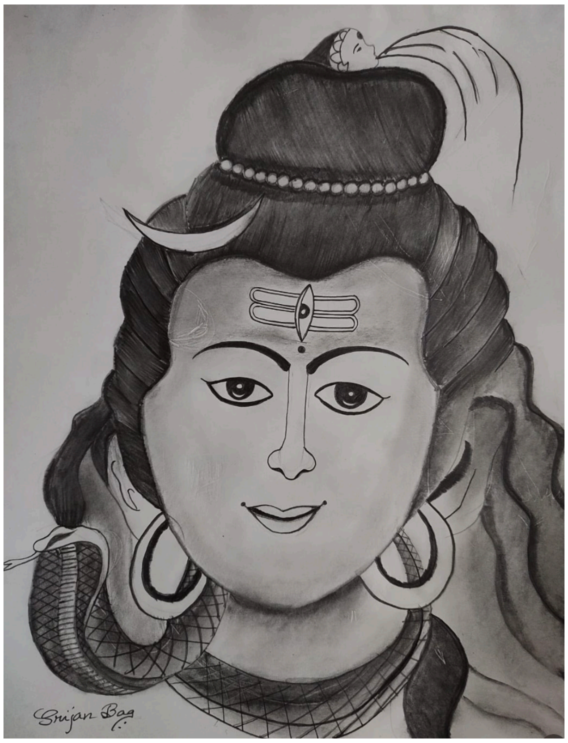

Pencil Shaded Sketches
Srijan Bag

Chandrayaan-3
Srijan Bag

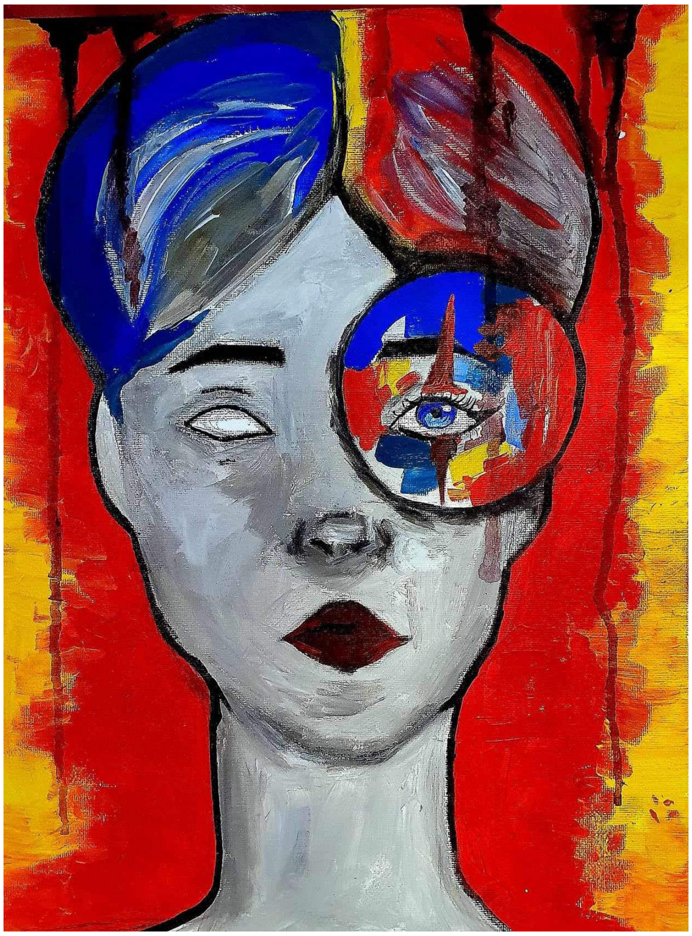

The Masks We Wear
Anaya Sinha

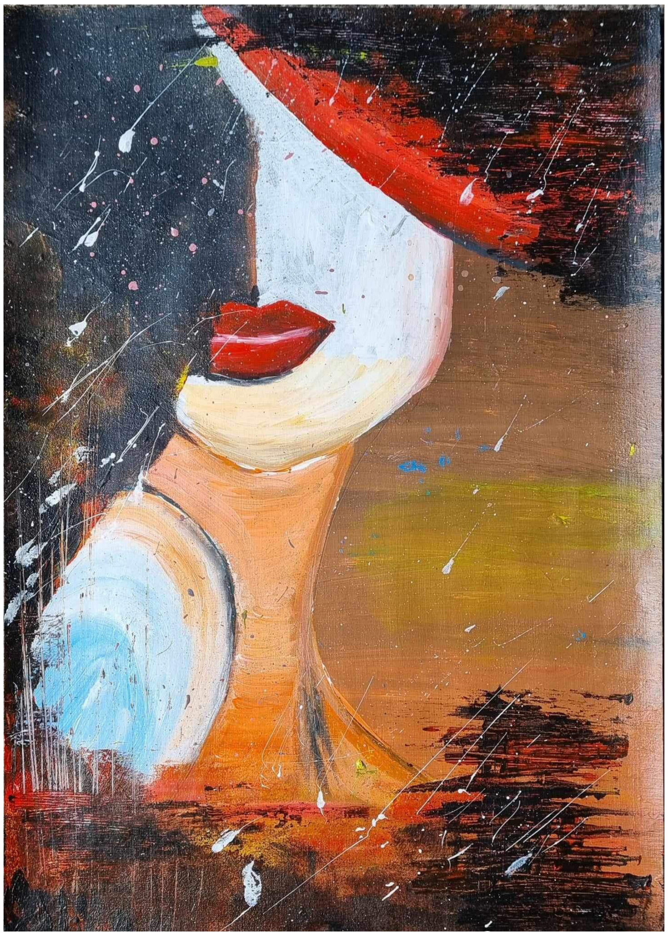

Lady in Red Painting
Arpita Sanyal

Silver Eye visiting the Garden
Pankaj Bhakta

Auckland Motorway
Pankaj Bhakta

Waikato Balloon Festival
Swayam Sarkar

Muriwai Sunset
Swayam Sarkar

ART & PHOTOGRAPHY
by our talented members

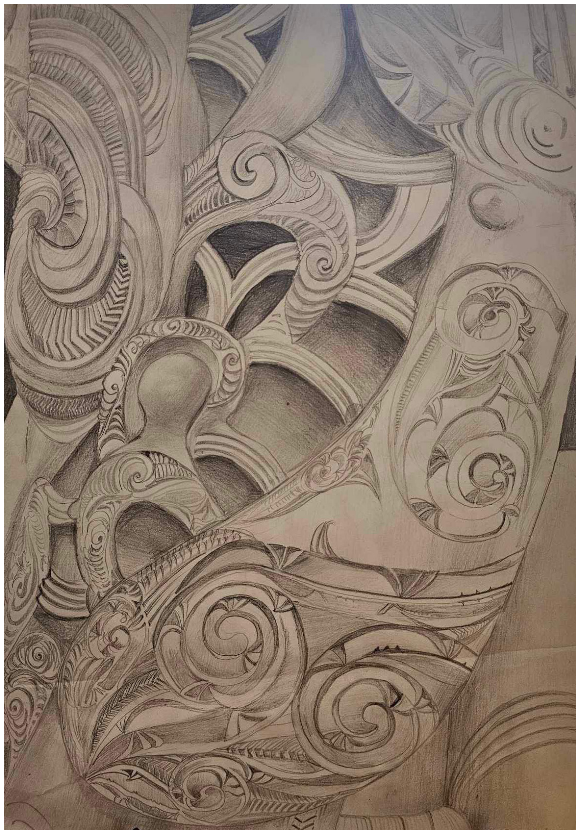

Canvas Maori Carving
Udayan Basu

Sketch- Home
Ankita Gomasta Bose

PRINTER AD

With Best Complements from

Top In Town Food City
SANDRINGHAM

Food City
Top in Town

With Best Complements from

SHIVANI
Restaurants

905 Dominion Road, Mount Roskill
Ph: 09 620 0707

23 Eric Baker Place, Papatoetoe
Ph: 09 250 4474

Importers and Distributors of well known brands and quality FMCG products

Urja
Edible Oils, Rice, Flour, Mango Pulp, Spices, Rusks, Biscuits & Tea

Rasoi Magic
Pre-mixes

MEU
Sauces, Drinks & Mackeral

Priya Gold
Cookies & Cream Biscuits

Tata
Salt

MTR
Ready To Eat Meals, Pre-mixes & Almond Drinks

India Gate
Basmati Rice

Nestle India
Noodles

Mavana
Insence Sticks

Bajaj
Cosmetics

Shan
Pre-mixes, Pink Salt, Pastes & Relishes

Midas
Papads, Chutneys, Pickles & Pastes

Bikano
Snacks, Sweets & Frozen Foods

Frooti & Appy
Drinks

Parachute
Cosmetics

VLCC
Personal Care Range

Cornitos
Nacho Crisps & Party Mix

Jabsons
Flavoured Peanuts & Snacks

AB INTERNATIONAL LTD | *"Bringing Together a World of Goodness"*

T (09) 256 1400 F (09) 256 1402 E orders@abinternational.co.nz